আত তাহরীম

৬৬

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতের لِمَ تُحَرِّمُ শব্দ থেকে এর নাম গৃহীত। এটিও সূরার বিষয়-ভিত্তিক শিরোনাম নয়। বরং এ নামের অর্থ হচ্ছে এ সূরার মধ্যে তাহরীম সম্পর্কিত বিষয়ের উল্লেখ আছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরার মধ্যে তাহরীম সম্পর্কিত যে ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে সে সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসের বর্ণনাসমূহে দু'জন মহিলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁরা দু'জনই নবীর (সা) স্ত্রী। তাঁদের একজন হলেন হযরত সাফিয়া (রা) এবং অন্যজন হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রা)। তাঁদের মধ্যে একজন অর্থাৎ হযরত সাফিয়া (রা) খায়বার বিজয়ের পরে নবীর (সা) সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। আর সর্বসম্মত মতে খায়বার বিজিত হয় ৭ম হিজরীতে। দ্বিতীয় মহিলা হযরত মারিয়াকে (রা) মিসরের শাসক মুকাওকিস ৭ম হিজরী সনে নবীর (সা) খেদমতের জন্য পাঠিয়েছিলেন। ৮ম হিজরীর যুলহাজ্জ মাসে তাঁরই গর্ভে নবীর (সা) পুত্র সন্তান হযরত ইবরাহীম (রা) জন্ম লাভ করেন। এসব ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে এ বিষয়টি প্রায় সুনির্দিষ্ট হয়ে যায় যে, এ সূরাটি ৭ম অথবা ৮ম হিজরীর কোন এক সময় নাযিল হয়েছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূরা। এ সূরার মধ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণের সাথে জড়িত কিছু ঘটনার প্রতি ইংগিত দিয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

এক ঃ হালাল হারাম এবং জায়েয নাজায়েযের সীমা নির্ধারণ করার ইখতিয়ার চূড়ান্তভাবে আল্লাহ তা'আলার হাতে। সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা খোদ আল্লাহ তা'আলার নবীর (সা) কাছেও তার কোন অংশ হস্তান্তর করা হয়নি। নবী নবী হিসেবে কোন জিনিসকে হারাম বা হালাল ঘোষণা করতে পারেন কেবল তখনই যখন এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন ইংগিত থাকে। সে ইংগিত কুরআন মজীদে নাযিল হয়ে থাক কিংবা তা অপ্রকাশ্য অহীর মাধ্যমে নাযিল হয়ে থাক তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু খোদ আল্লাহ কর্তৃক মোবাহকৃত কোন জিনিসকে নিজের পক্ষ থেকে হারাম করে নেয়ার অনুমতি কোন নবীকেও দেয়া হয়নি। এ ক্ষেত্রে অন্য কোন মানুষের তো প্রশ্নই ওঠে না।

দুই ঃ মানব সমাজে নবীর স্থান ও মর্যাদা অত্যন্ত নাজুক। একটি সাধারণ কথা যা অন্য কোন মানুষের জীবনে সংঘটিত হলে তা তেমন কোন গুরুত্বই বহন করে না, কিন্তু অনুরূপ ঘটনাই নবীর জীবনে সংঘটিত হলে আইনের মর্যাদা লাভ করে। তাই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অত্যন্ত কঠোরভাবে নবী-রসূলদের জীবন পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যাতে তাদের অতি ক্ষুদ্র কোন পদক্ষেপও আল্লাহর ইচ্ছার পরিপন্থী না হয়। নবীর দ্বারা এমন কোন ক্ষুদ্র কাজও সংঘটিত হয়ে গেলে সংগে সংগে তা সংশোধন করে দেয়া হয়েছে, যাতে ইসলামী আইন ও তার উৎস সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ রূপে শুধু আল্লাহর কিতাব আকারে নয় বরং নবীর "উসওয়ায়ে হাসানা" বা উত্তম জীবন আদর্শরূপে আল্লাহর বান্দাদের কাছে পৌছে এবং তার মধ্যে অণু পরিমাণও এমন কোন জিনিস সংমিশ্রিত হতে না পারে, আল্লাহর ইচ্ছা ও মর্জির সাথে যার কোন মিল নেই।

তিন ঃ ওপরে বর্ণিত মূলনীতির আলোকে আপনা থেকেই যে বিষয়টি বুঝা যায় তা এই যে, একটি ক্ষুদ্র বিষয়েও যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভুল দেখিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তা শুধু সংশোধনই করা হয়নি, বরং রেকর্ডভুক্তও করা হয়েছে তখন তা অকাট্যভাবে আমাদের মনে এ আস্থা সৃষ্টি করে যে, নবীর (সা) পবিত্র জীবনকালের যেসব কাজকর্ম ও হুকুম-আহকাম বর্তমানে আমরা পাচ্ছি, এবং যেসব কাজকর্ম ও হুকুম আহকাম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন তিরস্কার বা সংশোধনী রেকর্ডে নেই তা পুরাপুরি সত্য ও নির্ভুল এবং আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পূর্ণরূপে সংগতিপূর্ণ। ঐ সব কাজকর্ম ও আদেশ নিষেধ থেকে আমরা পূর্ণ আস্থার সাথে হিদায়াত ও পথনির্দেশ গ্রহণ করতে পারি।

কুরআন মজীদের এই বাণী থেকে চতুর্থ যে বিষয়টি সামনে আসে তা হচ্ছে, যে পবিত্র রসূলের সম্মান ও মর্যাদাকে আল্লাহ নিজে বান্দাদের ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসেবে গণ্য করেন সেই রসূল সম্পর্কে এ সূরাতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি তাঁর স্ত্রীদের খুশী করার জন্য একবার আল্লাহর হালালকৃত একটি জিনসকে নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন। আর নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীগণ, আল্লাহ নিজে যাদেরকে ঈমানদারদের মা বলে ঘোষণা করেন, এবং যাঁদেরকে সম্মান করার জন্য তিনি নিজে মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছেন কিছু ভুল-ক্রটির জন্য তাঁদেরকেই আবার তিনি কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। তাছাড়া নবীকে তিরস্কার এবং তাঁর স্ত্রীদেরকে সাবধান চুপিসারে করা হয়নি, বরং তা সেই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যা সমস্ত উম্মাতকে চিরদিন পড়তে হবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূল এবং উম্মুল মু'মিনীনদেরকে ঈমানদারদের দৃষ্টিতে হেয়প্রতিপন্ন করার অভিপ্রায়ে তাঁর কিতাবে এসব উল্লেখ করেননি। আল্লাহ তা'আলার এরূপ কোন অভিপ্রায় ছিল না, কিংবা তা থাকতেও পারে না। একথাও স্পষ্ট যে, পবিত্র কুরআনের এ সূরা পাঠ করে কোন মুসলমানের অন্তর থেকে তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা উঠে যায়নি। তাহলে কুরআনে এ কথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদেরকে তাঁদের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে সম্মান প্রদর্শনের সঠিক সীমারেখার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চান। নবীগণ কেবল নবীই, তাঁরা খোদা নন যে, তাঁদের কোন ভুল-ক্রটি হতে পারে না। নবীর মর্যাদা এ কারণে নয় যে, তাঁর কোন ভুল-ক্রটি হওয়া অসম্ভব। বরং নবীর মর্যাদা এ কারণে যে, তিনি আল্লাহর ইচ্ছার পূর্ণাঙ্গ বাস্তব রূপ। তাঁর

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভুল-ত্রুটিকেও আল্লাহ সংশোধন না করে ছেড়ে দেননি। এভাবে আমরা এ আস্থা ও প্রশান্তি লাভ করি যে, নবীর রেখে যাওয়া আদর্শ আল্লাহর ইচ্ছার বাস্তব প্রতিনিধিত্ব করছে। একইভাবে সাহাবা কিরাম হোন বা নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীগণ হোন, তাঁরা সবাই মানুষ ছিলেন, ফেরেশতা বা মানব সত্তার উর্ধে কিছু ছিলেন না। তাদেরও ভুল-ত্রুটি হওয়া সম্ভব ছিল। তাঁরা যে মর্যাদা লাভ করেছিলেন তার কারণ ছিল এই যে, আল্লাহর রসূলের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ তাঁদেরকে মানবতার সর্বোত্তম নমুনা বানিয়ে দিয়েছিল। তাঁদের যা কিছু সম্মান ও মর্যাদা তা এ কারণেই। তাঁরা ভুল-ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন এরূপ অনুমান ও মনগড়া ধারণার ওপর তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত নয়। এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কল্যাণময় যুগে সাহাবা কিরাম কিংবা নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীগণের দ্বারা মানবিক দুর্বলতার কারণে যখনই কোন ভুল-ত্রুটি সংঘটিত হয়েছে তখনই তাদের সতর্ক করা হয়েছে ও ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। নবী (সা) নিজেও তাদের কিছু কিছু ভুল-ত্রুটি সংশোধন করেছেন যা হাদীস গ্রন্থসমূহের বহু সংখ্যক জায়গায় উল্লেখ আছে। আল্লাহ তা'আলা নিজেও কুরআন মজীদে তাঁদের কিছু কিছু ভুল-ত্রুটির উল্লেখ করে তা সংশোধন করেছেন যাতে মুসলমানগণ কখনই তাদের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে সম্মান দেখানোর এমন কোন অতিরঞ্জিত ধারণা প্রতিষ্ঠিত করে না নেয় যা তাঁদেরকে মানুষের পর্যায় থেকে উঠিয়ে আল্লাহর মর্যাদায় বসিয়ে না দেয়। আপনি যদি চোখ খুলে কুরআন মজীদ অধ্যয়ন করেন তাহলে আপনার সামনে এর দৃষ্টান্ত একের পর এক আসতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা সূরা আলে ইমরানে ওহুদ যুদ্ধের আলোচনা প্রসংগে সাহাবা কিরামদের সম্বোধন করে বলেছেন ঃ

"আল্লাহ তা'আলা (সাহায্য-সহযোগিতার) যে প্রতিশ্রুতি তোমাদের দিয়েছিলেন তা তিনি পূরণ করেছেন যখন তোমরা তাদেরকে তাঁর ইচ্ছায় হত্যা করছিলে। অবশেষে তোমরা যখন দুর্বলতা দেখালে এবং কাজের ব্যাপারে মতানৈক্য করলে আর যে জিনিসের আকাংখা তোমরা করছিলে আল্লাহ তা'আলা যেই মাত্র তোমাদের সেই জিনিস দেখালেন (অর্থাৎ গনীমতের সম্পদ) তখনই তোমরা তার হুকুমের নাফরমানি করে বসলে। তোমাদের মধ্যে কেউ ছিল পার্থিব স্বার্থের প্রত্যাশী এবং কেউ ছিলে আখেরাতের প্রত্যাশী। এ অবস্থায় তোমাদের পরীক্ষার জন্য আল্লাহ তাদের মোকাবেলায় তোমাদের পরাস্ত করে দিলেন। আল্লাহ ঈমানদারদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ও মেহেরবান।" (আয়াত, ১৫২)

অনুরূপভাবে সূরা নূরে হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে অপবাদের উল্লেখ করে আল্লাহ সাহাবীগণকে বলেন ঃ

"এমনটা কেন হলো না যে, যখন তোমরা এ বিষয়টি শুনেছিলে মু'মিন নারী ও পুরুষ সবাই নিজে সে বিষয়ে ভাল ধারণা পোষণ করতে এবং বলে দিতে যে, এটা তো স্পষ্ট অপবাদ। ...... দুনিয়া ও আখেরাতে যদি তোমাদের ওপর আল্লাহর মেহেরবানী ও দয়া না হতো তাহলে যে বিষয়ের মধ্যে তোমরা নিক্ষিপ্ত হয়েছিলে তার পরিণামে কঠিন আযাব তোমাদের গ্রাস করতো। একটু ভেবে দেখ, যখন তোমাদের মুখে মুখে কাহিনীটার চর্চা হচ্ছিল এবং তা ছড়াচ্ছিল এবং তোমরা এমন কিছু বলছিলে যে বিষয়ে তোমাদের কিছুই জানা ছিল না। তোমরা এটাকে একটা মামুলি ব্যাপার মনে করছিলে। কিন্তু আল্লাহর কাছে তা ছিল গুরুতর বিষয়। কেন তোমরা এ কথা শোনামাত্র বললে না যে, আমাদের জন্য

এরূপ কথা মুখে আনাও শোভা পায় না। সুবহানাল্লাহ! এটা তো একটা গুরুতর অপবাদ? আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক তাহলে ভবিষ্যতে আর কখনো যেন তোমরা এরূপ আচরণ না করো।" (আয়াত, ১২ থেকে ১৭)।

সূরা আহযাবে নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীগণকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে ঃ

"হে নবী, তোমার স্ত্রীদের বলো, তোমরা দুনিয়া ও তার চাকচিক্য চাও তাহলে এসো আমি তোমাদের কিছু দিয়ে উত্তম রূপে বিদায় করে দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং আখেরাতের প্রত্যাশী হয়ে থাকো তাহলে জেনে রাখ, তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল আল্লাহ তাদের জন্য বিরাট পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।" (আয়াত, ২৮, ২৯)।

সূরা জুম'আতে সাহাবীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

"তারা ব্যবসায়-বাণিজ্য ও খেল-তামাশা দেখে সে দিকে ছুটে গেল এবং (হে নবী,) তোমাকে (খোতবা দানরত অবস্থায়) দণ্ডায়মান রেখে গেল। তাদের বলো, আল্লাহর কাছে যা কিছু আছে তা খেল-তামাশা ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের চেয়ে উত্তম। আল্লাহ সর্বোত্তম রিযিকদাতা।" (আয়াত ১১)

মক্কা বিজয়ের পূর্বে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী হযরত হাতেব ইবনে আবী বালতায়া নবীর (সা) মক্কা অভিযানের খবর গোপনে কুরাইশদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সূরা মুমতাহিনায় তাঁর এ কাজের কঠোর সমালোচনা ও তিরস্কার করা হয়েছে।

কুরআন মজীদের মধ্যেই এসব উদাহরণ বর্তমান, যে কুরআন মজীদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা সাহাবা কিরাম এবং নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীগণের সম্মান ও মর্যাদা নিজে বর্ণনা করেছেন এবং তাদেরকে রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদু আনহু অর্থাৎ তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট এবং আল্লাহও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট বলে ফরমান শুনিয়েছেন। সম্মানিত ব্যক্তিদের সম্মান দেখানোর এই শিক্ষা মধ্যপন্থার ওপর ভিত্তিশীল। এ শিক্ষা মুসলমানদেরকে মানুষ পূজার সেই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করেছে যার মধ্যে ইহুদী ও খৃষ্টানরা নিপতিত হয়েছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বড় বড় মনীষী হাদীস, তাফসীর এবং ইতিহাস বিষয়ে যেসব গ্রন্থ রচনা করেছেন তার মধ্যে যেসব জায়গায় সাহাবায়ে কিরাম, নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীগণ এবং অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের মর্যাদা ও পূর্ণতার যে বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে তাদের দুর্বলতা, বিচ্যুতি এবং ভুল-ত্রুটির ঘটনা বর্ণনা করতেও দ্বিধা করা হয় নাই। অথচ বর্তমান সময়ের সম্মান প্রদর্শনের দাবীদারদের তুলনায় তাঁরা তাঁদের বেশী মর্যাদা দিতেন এবং সম্মান প্রদর্শনের সীমারেখাও তারা এদের চেয়ে বেশী জানতেন।

পঞ্চম যে কথাটি এ সূরায় খোলাখুলি বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে, আল্লাহর দীন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও নিখুঁত। এ দীন অনুসারে ঈমান ও আমলের বিচারে প্রত্যেকের যা প্রাপ্য তাই সে পাবে। অতি বড় কোন বোজর্গের সাথে ঘনিষ্ঠতাও তার জন্য আদৌ কল্যাণকর নয় এবং অত্যন্ত খারাপ কোন ব্যক্তির সাথে সম্পর্কও তার কোন ক্ষতি করতে পারে না। এ ব্যাপারে বিশেষ করে নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীগণের সামনে উদাহরণ হিসেবে তিন শ্রেণীর

স্ত্রীলোককে পেশ করা হয়েছে। একটি উদাহরণ দেয়া হয়েছে হযরত নূহ (আ) ও হযরত লূতের (আ) স্ত্রীদের। তারা যদি ঈমান আনয়ন করত এবং তাদের মহাসম্মানিত স্বামীর সাথে সহযোগিতা করত তাহলে মুসলিম উম্মার মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণের যে মর্যাদা তাদের মর্যাদাও তাই হতো। কিন্তু যেহেতু তারা এর বিপরীত আচরণ ও পন্থা অবলম্বন করেছে, তাই নবীদের স্ত্রী হওয়াটাও তাদের কোন কাজে আসেনি এবং তারা জাহান্নামের অধিবাসী হয়েছে। দ্বিতীয় উদাহরণ দেয়া হয়েছে ফেরাউনের স্ত্রীর। যদিও তিনি আল্লাহর জঘন্য এক দুশমনের স্ত্রী ছিলেন কিন্তু যেহেতু তিনি ঈমান গ্রহণ করেছিলেন এবং ফেরাউনের কওমের কাজ কর্ম থেকে নিজের কাজ কর্মের পথ সম্পূর্ণ আলাদা করে নিয়েছিলেন তাই ফেরাউনের মত চরম পর্যায়ের কাফেরের স্ত্রী হওয়াও তাঁর কোন ক্ষতির কারণ হয়নি। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাতের উপযুক্ত বানিয়ে দিয়েছেন। তৃতীয় উদাহরণ দেয়া হয়েছে হযরত মারয়াম আলাইহিস সালামের। তাঁর এই বিরাট মর্যাদা লাভের কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যে কঠিন পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করার ফায়সালা করেছিলেন তা তিনি মাথা পেতে গ্রহণ করেছেন। তাঁকে কুমারী অবস্থায় আল্লাহর হুকুমে মু'জিযা হিসেবে গর্ভবতী বানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং এভাবে তাঁর রব তাঁর দ্বারা কি কাজ নিতে চান তাও তাকে বলে দেয়া হয়েছে। হযরত মারয়াম ছাড়া পৃথিবীর আর কোন অভিজাত ও নেক্‌কার মহিলাকে এরূপ কোন কঠিন পরীক্ষার মধ্যে কখনো ফেলা হয়নি। হযরত মারয়াম এ ব্যাপারে যখন কোন আফসোস ও আর্তনাদ করেননি বরং একজন খাঁটি ঈমানদার নারী হিসেবে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা পূরণ করার জন্য যা বরদাশত করা অপরিহার্য ছিল তা সবই বরদাশত করা স্বীকার করেছেন তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে سيدة النساء فى الجنة 'বেহেশতের মহিলাদের নেত্রী' (মুসনাদে আহমাদ) হওয়ার মত সুউচ্চ মর্যাদা দান করেছেন।

এসব বিষয় ছাড়াও আমরা আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য এ সূরা থেকে জানতে পারি। তা হচ্ছে, কুরআন মজীদে যা কিছু লিপিবদ্ধ আছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কেবল সেই জ্ঞানই আসতো না। বরং তাঁকে অহীর মাধ্যমে অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞানও দেয়া হতো যা কুরআনে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। এ সূরার ৩নং আয়াত তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। তাতে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পবিত্র স্ত্রীদের একজনের কাছে গোপনীয় একটি কথা বলেছিলেন। কিন্তু তিনি তা অন্য কাউকে বলেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দিলেন। অতপর নবী (সা) এই ত্রুটির জন্য তাঁর সেই স্ত্রীকে সতর্ক করে দিলেন। এতে তাঁর স্ত্রী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তাঁর এই ত্রুটি সম্পর্কে তাঁকে কে অবহিত করেছেন। নবী (সা) জবাব দিলেন। যে সত্তা আলীম ও খাবীর তিনিই আমাকে তা জানিয়েছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, গোটা কুরআন মজীদের মধ্যে সেই আয়াতটি কোথায় যার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীকে গোপনীয় যে কথা বলেছিলে তা সে অন্যের কাছে বা অমুকের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছে? কুরআনে যদি এমন কোন আয়াত না থেকে থাকে এবং এটা সুস্পষ্ট যে, তা নেই তাহলে এটাই এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, কুরআন ছাড়াও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অন্য অহী আসতো। কুরআন ছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আর কোন অহী আসতো না, হাদীস অস্বীকারকারীদের এ দাবী এর দ্বারা বাতিল হয়ে যায়।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَٰجِكَ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ①

হে নবী, আল্লাহ যে জিনিস হালাল করেছেন তা তুমি হারাম করছো কেন?[১] (তা কি এ জন্য যে,) তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাও?[২] আল্লাহ ক্ষমাশীল এবং দয়ালু।[৩]

১. এটা মূলত প্রশ্ন নয়, বরং অসন্তোষের বহিপ্রকাশ। অর্থাৎ এর উদ্দেশ্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ কথা জিজ্ঞেস করা নয় যে, আপনি এ কাজ কেন করেছেন? বরং তাঁকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়াই উদ্দেশ্য যে, আল্লাহর হালালকৃত জিনিসকে নিজের জন্য হারাম করে নেয়ার যে কাজ আপনার দ্বারা হয়েছে, তা আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয়। এ থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে বুঝা যায় যে, আল্লাহর হালালকৃত জিনিস হারাম করার অধিকার কারো নেই, এমন কি স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজেরও এই ইখতিয়ার নেই। নবী (সা) ঐ জিনিসটিকে যদিও আকীদাগতভাবে হারাম মনে করেছিলেন না কিংবা শরীয়াতসম্মতভাবে হারাম বলে সাব্যস্ত করেছিলেন না, বরং নিজের জন্য তা ব্যবহার করা হারাম করে নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মর্যাদা যেহেতু সাধারণ একজন মানুষের মত ছিল না বরং তিনি আল্লাহর রসূলের মর্যাদায় অভিসিক্ত ছিলেন। তাই তাঁর নিজের পক্ষ থেকে নিজের ওপর কোন জিনিস হারাম করে নেয়াতে এই আশংকা ছিল যে, তাঁর উম্মাতও ঐ জিনিসকে হারাম অথবা অন্তত মাকরূহ বলে মনে করতে আরম্ভ করবে অথবা উম্মাতের লোকেরা মনে করতে শুরু করবে যে, আল্লাহর হালালকৃত কোন জিনিস নিজের জন্য হারাম করে নেয়ায় কোন দোষ নেই। এ কারণে আল্লাহ তা'য়ালা এ কাজের জন্য তাঁকে তিরস্কার করেছেন এবং নিজে হারাম করে নেয়ার এই কাজ থেকে বিরত থাকার হুকুম দিয়েছেন।

২. এ থেকে জানা যায় যে, হারাম করে নেয়ার এই কাজটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের ইচ্ছায় করেছিলেন না। বরং তাঁর স্ত্রীগণ চেয়েছিলেন তিনি যেন এরূপ করেন। আর তাই তিনি শুধু তাঁদের খুশী করার জন্য একটি হালাল বস্তুকে নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন। এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, হারাম করে নেয়ার এ কাজটি সম্পর্কে তিরস্কার করার সাথে আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে তার এই কারণটি কেন

উল্লেখ করলেন? এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, আল্লাহর বাণীর উদ্দেশ্য যদি শুধু হালালকে হারাম করে নেয়া থেকে নবীকে (সা) বিরত রাখা হতো তাহলে আয়াতের প্রথমাংশ দ্বারাই এ উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যেতো। যে কারণে তিনি এ কাজ করেছিলেন তা স্পষ্ট করে বলার কোন প্রয়োজন ছিল না। তা বিশেষভাবে বর্ণনা করায় স্পষ্ট বুঝা যায় যে, হালালকে হারাম করে নেয়ার কারণে শুধু নবীকে (সা)–ই তিরস্কার করা উদ্দেশ্য নয়। বরং সাথে সাথে তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণকেও এ বিষয়ে সতর্ক করে দেয়া যে, নবীর স্ত্রী হওয়ার কারণে যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তাঁদের ছিল তা তাঁরা উপলব্ধি কনেননি এবং তাঁকে দিয়ে এমন একটি কাজ করিয়েছেন যার দ্বারা একটি হালাল জিনিস হারাম হয়ে যাওয়ার বিপজ্জনক দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হতে পারতো।

নবী (সা) নিজের জন্য যে জিনিসটি হারাম করে নিয়েছিলেন সেটি কি ছিল কুরআন মজীদে যদিও তা বলা হয়নি কিন্তু মুহাদ্দিস ও মুফাস্‌সিরগণ এ আয়াত নাযিলের কারণ হিসেবে দু'টি ভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করেছেন। একটি ঘটনা হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রা) সম্পর্কিত এবং অপর ঘটনাটি হলো নবী (সা) মধু পান না করার শপথ করেছিলেন।

হযরত মারিয়ার (রা) ঘটনা হলো, হুদায়রিয়ার সন্ধির পর রসূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশপাশের বাদশাহদের কাছে যেসব পত্র দিয়েছিলেন তার মধ্যে আলেকজান্দ্রিয়ার রোমান খৃষ্টান ধর্মযাজকের (Patriarch) কাছেও একটি পত্র দিয়েছিলেন। আরবরা তাকে মুকাওকিস বলে অভিহিত করত। হযরত হাতেব ইবনে আবী বালতা'আ এই মহামূল্যবান পত্রখানা নিয়ে তার কাছে পৌঁছলে তিনি ইসলাম কবুল করেননি কিন্তু তাঁর সাথে ভাল ব্যবহার করলেন এবং পত্রের উত্তরে লিখলেন ঃ "আমি জানি আরো একজন নবী আসতে এখনো বাকী। তবে আমার ধারণা ছিল তিনি সিরিয়ায় আসবেন। তা সত্ত্বেও আমি আপনার দূতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছি এবং কিবতীদের মধ্যে অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী দু'টি মেয়েকে পাঠাচ্ছি।" (ইবনে সা'দ) মেয়ে দু'টির মধ্যে একজনের নাম সিরীন এবং অপর জনের নাম মারিয়া। (খৃষ্টানরা হযরত মারয়ামকে মারিয়া MARY বলে থাকে। মিসর থেকে ফেরার পথে হযরত হাতিব তাদের উভয়কে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানালে তারা ইসলাম গ্রহণ করেন। অতপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাজির হলে তিনি সিরীনকে হযরত হাসসান (রা) ইবনে সাবেতের মালিকানায় দিয়ে দেন এবং মারিয়াকে তাঁর হারামের অন্তরভুক্ত করেন। ৮ হিজরীর যুলহাজ্জ মাসে তাঁর গর্ভে নবীর (সা) পুত্র ইবরাহীম জন্মলাভ করেন (আল ইসতিয়াব–আল ইসাবা)। এই মহিলা ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী। হাফেজ ইবনে হাজার তাঁর আল ইসাবা গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে হযরত আয়েশার (রা) এ উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন। মারিয়ার আগমন আমার কাছে যতটা অপছন্দীয় হয়েছে অন্য কোন মহিলার আগমন ততটা অপছন্দনীয় হয়নি। কারণ, তিনি ছিলেন অতিব সুন্দরী এবং নবী (সা) তাঁকে খুব পছন্দ করেছিলেন। বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হাদীসসমূহে তাঁর সম্পর্কে যে কাহিনী উদ্ধৃত হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে, নবী (সা) একদিন হযরত হাফসার ঘরে গেলে তিনি সেখানে ছিলেন না। সেই সময় হযরত মারিয়া সেখানে তাঁর কাছে আসেন এবং তাঁর সাথে নির্জনে কাটান। হযরত হাফসা তা অপছন্দ করলেন এবং তিনি এ বিষয়ে কঠোর ভাষায় নবীর (সা) কাছে অভিযোগ করলেন। তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য নবী (সা) তাঁর কাছে ওয়াদা

করলেন যে, তিনি ভবিষ্যতে মারিয়ার সাথে কোন প্রকার দাম্পত্য সম্পর্ক রাখবেন না। কিছু সংখ্যক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি মারিয়াকে নিজের জন্য হারাম করে নিলেন। আবার কোন কোন রেওয়ায়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ ব্যাপারে তিনি শপথও করেছিলেন। এসব হাদীস বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাবেয়ীদের থেকে 'মুরসাল' হাদীস হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে কিছু সংখ্যক হাদীস হযরত উমর (রা), হযরত আবদুল্লাহ (রা) ইবনে আব্বাস এবং হযরত আবু হুরাইরা থেকেও বর্ণিত হয়েছে। এসব হাদীসের সনদের আধিক্য দেখে এর কোন না কোন ভিত্তি আছে বলে হাফেজ ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে ধারণা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সিহাহ সিত্তার কোন গ্রন্থেই এ কাহিনী উদ্ধৃত হয়নি। নাসায়ীতে হযরত আনাস থেকে শুধু এতটুকু উদ্ধৃত হয়েছে যে, নবীর (সা) একটি দাসী ছিল যার সাথে তিনি দাম্পত্য সম্পর্ক রাখতেন। এই ঘটনার পর হযরত হাফসা (রা) এবং হযরত আয়েশা (রা) তাঁর পিছে লাগলেন। যার কারণে নবী (সা) তাকে নিজের জন্য হারাম করে নিলেন। এ কারণে এ আয়াত নাযিল হয় ঃ হে নবী, আল্লাহ যে জিনিস তোমার জন্য হালাল করেছেন তা তুমি হারাম করে নিচ্ছ কেন?

দ্বিতীয় ঘটনাটি বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী এবং অপর কিছু সংখ্যক হাদীস গ্রন্থে স্বয়ং হযরত আয়েশা (রা) থেকে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তার সারসংক্ষেপ এই যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণত প্রতিদিন আসরের পর পবিত্র স্ত্রীগণের সবার কাছে যেতেন। একবার তিনি যয়নাব বিনতে জাহাশের কাছে গিয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বসলেন। কারণ, কোথাও থেকে তাঁর কাছে মধু পাঠানো হয়েছিল। আর নবী (সা) মিষ্টি খুব ভালবাসতেন। তাই তিনি তাঁর কাছে মধুর শরবত পান করতেন।

হযরত আয়েশা বর্ণনা করেন, এ কারণে খুব হিংসা হলো এবং আমি হযরত হাফসা (রা), হযরত সাওদা (রা) ও হযরত সাফিয়ার সাথে মিলিত হয়ে এ মর্মে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, নবী (সা) আমাদের যার কাছেই আসবেন সেই তাঁকে বলবে, আপনার মুখ থেকে মাগাফিরের গন্ধ আসছে। মাগাফির এক প্রকার ফুল যার মধ্যে কিছুটা দুর্গন্ধ থাকে। মৌমাছি উক্ত ফুল থেকে মধু আহরণ করলে তার মধ্যেও ঐ দুর্গন্ধের কিছুটা লেশ বর্তমান থাকে। এ কথা সবাই জানতেন যে, নবী (সা) অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও রুচিশীল ছিলেন। তাঁর শরীর থেকে কোন প্রকার দুর্গন্ধ আসুক তিনি তা একেবারেই অপছন্দ করতেন। তাই হযরত যয়নাবের কাছে তাঁর দীর্ঘ অবস্থানকে বন্ধ করার জন্য এই কৌশল অবলম্বন করা হলো এবং তা ফলবতী হলো। যখন কয়েকজন স্ত্রী তাঁকে বললেন যে, তাঁর মুখ থেকে মাগাফিরের গন্ধ আসে তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে, আর কখনো তিনি মধু পান করবেন না। একটি হাদীসে তাঁর বক্তব্যের ভাষা উদ্ধৃত হয়েছে এরূপঃ فلن اعود له وقد حلفت "আমি আর কখনো এ জিনিস পান করবো না, আমি শপথ করেছি।" অপর একটি হাদীসে শুধু فلن اعود له কথাটি আছে وقد حلفت কথাটির উল্লেখ নেই। ইবনে আব্বাস থেকে যে হাদীসটি ইবনুল মুনযির। ইবনে আবী হাতেম, তাবারানী এবং ইবনে মারদুয়া বর্ণনা করেছেন তাতে বক্তব্যের ভাষা হলো ঃ والله لا اشربه আল্লাহর কসম, আমি আর তা পান করবো না।

বড় বড় মনীষী এই দু'টি কাহিনীর মধ্যে দ্বিতীয় কাহিনীটিকে সঠিক বলে মেনে নিয়েছেন এবং প্রথম কাহিনীটিকে অনির্ভরযোগ্য বলে সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম নাসায়ী

قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿٢﴾

আল্লাহ তোমাদের জন্য কসমের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হওয়ার পন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।[৪] আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক এবং তিনি মহাজ্ঞানী ও মহা কৌশলী।[৫]

বলেন ঃ "মধুর ঘটনা সম্পর্কিত ব্যাপারে হযরত আয়েশার (রা) বর্ণিত হাদীস বিশুদ্ধ। এবং হযরত মারিয়াকে (রা) হারাম করে নেয়ার ঘটনা কোন উত্তম সনদে বর্ণিত হয়নি।" কাজী আয়াজ বলেন ঃ "নির্ভুল কথা এই যে, এ আয়াতটি হযরত মারিয়ার (রা) ব্যাপারে নয়, বরং মধু সম্পর্কিত ব্যাপারে নাযিল হয়েছে।" কাজী আবু বকর ইবনুল আরাবীও মধু সম্পর্কিত কাহিনীকেই বিশুদ্ধ বলে মনে করেন এবং ইমাম নববী ও হাফেজ বদরুদ্দীন আইনীও এই মতটিই পোষণ করেন। ফাতহুল কাদির নামক ফিকাহ গ্রন্থে ইমাম ইবনে হুমাম বলেন ঃ মধু হারাম করে নেয়ার কাহিনী বুখারী ও মুসলিম হাদীস গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রা) নিজে বর্ণনা করেছেন যাঁকে নিয়ে এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল। সুতরাং এ বর্ণনাটিই অধিক নির্ভরযোগ্য। হাফেজ ইবনে কাসীর বলেন ঃ সঠিক কথা হলো, নিজের জন্য মধু পান হারাম করে নেয়া সম্পর্কে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

৩. অর্থাৎ স্ত্রীদের সন্তুষ্টির জন্য একটি হালাল জিনিসকে হারাম করে নেয়ার যে কাজ আপনার দ্বারা হয়েছে সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল পদমর্যাদার দিক দিয়ে তা যদিও যথোচিত হয়নি, কিন্তু তা গোনাহর কাজও নয় যে, সে জন্য পাকড়াও করা যেতে পারে। তাই আল্লাহ তা'আলা শুধু সে ভুল দেখিয়ে দিয়ে সংশোধন করে দেয়াকেই যথেষ্ট মনে করেছেন এবং তাঁর এই ত্রুটি মাফ করে দিয়েছেন।

৪. অর্থাৎ একটি হালাল বস্তুকে নিজের ওপর হারাম করে নেয়ার যে কসম আপনি করেছেন সূরা মায়েদার ৮৯ আয়াতে কাফ্ফারা দিয়ে কসম ভঙ্গ করার ও তার বাধ্যবাধকতা থেকে বেরিয়ে আসার যে পন্থা আল্লাহ তা'আলা নির্ধারিত করে দিয়েছেন তদনুযায়ী কাজ করে আপনি তা ভঙ্গ করুন। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফিকহী প্রশ্ন দেখা দেয়। তাহলো যে ক্ষেত্রে কেউ কসম করে হালাল জিনিসকে হারাম করে নিয়েছে সে ক্ষেত্রে এ সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য হবে না কি কসমের বাক্য মুখে বলা হোক বা না হোক কার্যত হারাম করে নেয়াটাই কসম করার সমার্থক হবে ? এ ব্যাপারে ফিকাহবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে।

একদল ফিকাহবিদ বলেন ঃ শুধু হারাম করে নেয়া কসম নয়। কেউ যদি কোন জিনিসকে তা স্ত্রী হোক বা অন্য কোন হালাল বস্তু হোক কসম করা ছাড়াই নিজের জন্য হারাম করে নেয় তাহলে তা হবে একটি অনর্থক কাজ। এ জন্য কোন কাফ্ফারা দিতে হবে না। বরং সে যে জিনিস হারাম করে নিয়েছে কাফ্ফারা না দিয়েই তা ব্যবহার করতে পারবে। মাসরূক, শা'বী, রাবী'আ এবং আবু সালামা এমত পোষণ করেছেন। ইবনে জারীর এবং জাহেরীগণ এ মতটিই অবলম্বন করেছেন। তাঁদের মধ্যে তাহরীম বা হারাম করে নেয়া কেবল তখনই কসম বলে গণ্য হবে যখন কেউ কোন বস্তুকে নিজের জন্য হারাম

করে নেয়ার সময় কসমের ভাষা ব্যবহার করবে। এ ক্ষেত্রে তাঁদের যুক্তি হলো, বিভিন্ন রেওয়ায়াত অনুসারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু হালাল জিনিসকে নিজের জন্য হারাম করে নেয়ার সাথে কসমও করেছিলেন তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বলেছেন ঃ আমি কসমের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হওয়ার যে পন্থা নির্ধারিত করে দিয়েছি আপনি তদনুযায়ী কাজ করুন।

অপর একদলের মতে, কসমের শব্দ ও ভাষা প্রয়োগ করা ছাড়া কোন জিনিসকে হারাম করে নেয়া কসম নয় বটে, তবে স্ত্রীর ক্ষেত্রে তা ব্যতিক্রম। অন্যান্য বস্তু যেমন কাপড়চোপড় বা খাদ্য দ্রব্যকে কেউ যদি নিজের জন্য হারাম করে নেয় তাহলে তা একটি অর্থহীন কাজ। কোন কাফ্ফারা দেয়া ছাড়াই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তা ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু স্ত্রী বা দাসী সম্পর্কে সে যদি বলে যে, তার সাথে সহবাস করা আমার জন্য হারাম তাহলে তা হারাম হবে না বটে, কিন্তু তার কাছে যাওয়ার পূর্বে কসমের কাফ্ফারা অবশ্যই দিতে হবে। এ সিদ্ধান্ত শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীদের। (মুগনিউল মুহতাজ) মালেকী মাযহাবের অনুসারীগণও অনেকটা অনুরূপ মত অনুসরণ করে থাকেন। (আহকামুল কুরআন লি ইবনিল আরাবী)

তৃতীয় আরেকটি দলের মত হলো, কসমের বাক্য ব্যবহার করা হোক বা না হোক তাহরীমের কাজটাই কসম বলে গণ্য হবে। এটি হযরত আবু বকর সিদ্দীক, হযরত আয়েশা, হযরত উমর, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর, হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমের মত। যদিও বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রা) আরো একটি মত বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ اذا حرم امراته فليس بشئ (কেউ যদি তার স্ত্রীকে হারাম করে নেয় তাহলে তা কিছুই না)। কিন্তু এ কথার ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই যে, তাঁর মতে এটা তালাক বলে গণ্য হবে না বরং কসম বলে গণ্য হবে এবং তাকে কাফ্ফারা দিতে হবে। কারণ, বুখারী, মুসলিম ও ইবনে মাজায় ইবনে আব্বাসের (রা) এ উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে যে, হারাম বলে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কাফ্ফারা দিতে হবে। নাসায়ীতে বর্ণিত হয়েছে যে, এ বিষয়ে ইবনে আব্বাসকে (রা) জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন ঃ সে তোমার জন্য হারাম হয়ে যায়নি তবে তোমার জন্য কাফ্ফারা দেয়া অপরিহার্য। ইবনে জারীরের রেওয়ায়াতে ইবনে আব্বাসের (রা) বক্তব্যের ভাষা হলো ঃ আল্লাহ তা'আলা যা হালাল করেছেন তা যদি মানুষ নিজের জন্য হারাম করে থাকে তাহলে নিজের কসমের কাফ্ফারা আদায় করা তার জন্য অপরিহার্য। হাসান বসরী, আতা, তাউস, সুলায়মান ইবনে ইয়াসার, ইবনে জুবায়ের এবং কাতাদা প্রমুখ এমত পোষণ করেছেন। আর হানাফীরা এমতটি গ্রহণ করেছেন। ইমাম আবু বকর জাসসাস বলেন ঃ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ আয়াতটির শব্দাবলী এ কথা বুঝায় না যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হারাম করে নেয়ার সাথে সাথে কসমও করেছিলেন। তাই একথা স্বীকার করতেই হবে যে, 'তাহরীম' বা হারাম করে নেয়াটাই কসম। কারণ আল্লাহ তা'আলা পরে এই তাহরীমের ব্যাপারেই কসমের কাফ্ফারা ওয়াজিব করে দিয়েছেন। আরো একটু অগ্রসর হয়ে তিনি বলেছেন ঃ আমাদের মনীষীগণ (অর্থাৎ হানাফী মনীষীগণ) তাহরীমকে কেবল সেই ক্ষেত্রে কসম বলে গণ্য করেছেন যে ক্ষেত্রে তালাকের

নিয়ত থাকবে না। কেউ যদি তার স্ত্রীকে হারাম বলে তাহলে সে যেন প্রকারান্তরে বলে যে, আল্লাহর শপথ, আমি তোমার কাছে আসবো না। অতএব সে ঈলা বা কসম করে বসলো। আর সে যদি পানাহারের কোন বস্তু নিজের জন্য হারাম করে নিয়ে থাকে তাহলে প্রকারান্তরে সে যেন বললো, আল্লাহর শপথ, আমি ঐ জিনিস ব্যবহার করবো না। কারণ, আল্লাহ তা'আলা প্রথমে বলেছেন ঃ আল্লাহ আপনার জন্য যে জিনিস হালাল করে দিয়েছেন তা আপনি হারাম করছেন কেন? তারপরে বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য কসমের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হওয়ার পন্থা নিরূপণ করে দিয়েছেন। এভাবে আল্লাহ তা'আলা তাহরীমকে কসম বলে গণ্য করেছেন এবং 'তাহরীম' শব্দটি অর্থগত ও শরয়ী হুকুমের দিক দিয়ে কসমের সমার্থক হয়ে গিয়েছে।

স্ত্রীকে হারাম করে নেয়া এবং স্ত্রী ছাড়া অন্য সব জিনিস হারাম করে নেয়ার ব্যাপারে ফিকাহবিদদের দৃষ্টিতে শরয়ী হুকুম কি, সর্বসাধারণের উপকারার্থে এখানে সে বিষয়টি বলে দেয়াও যথোপযুক্ত হবে বলে মনে হয়।

হানাফী ফিকাহবিদদের মতে, কেউ যদি তালাকের নিয়ত ছাড়াই স্ত্রীকে নিজের জন্য হারাম করে নেয় অথবা এ মর্মে শপথ করে যে, সে আর তার কাছে যাবে না তাহলে তা ঈলা বলে গণ্য হবে এবং সে ক্ষেত্রে স্ত্রীর সান্নিধ্যে যাওয়ার আগে তাকে কসমের কাফ্ফারা দিতে হবে। কিন্তু সে যদি তালাকের নিয়তে এ কথা বলে থাকে, তুমি আমার জন্য হারাম তাহলে কি উদ্দেশ্যে তা বলেছে তা জেনে নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে সে যদি তিন তালাকের নিয়ত করে থাকে তাহলে তিন তালাক হয়ে যাবে। আর যদি এর চেয়ে কম সংখ্যক তালাকের নিয়ত করে থাকে, তা এক তালাকের নিয়ত হোক বা দুই তালাকের নিয়ত হোক উভয় অবস্থায় এক তালাক মাত্র কার্যকর হবে। আর কেউ যদি বলে আমার জন্য যা হালাল ছিল তা হারাম হয়ে গিয়েছে তাহলে স্ত্রীকে হারাম করার নিয়তে এ কথা না বলা পর্যন্ত স্ত্রীর জন্য তা প্রযোজ্য হবে না। স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন জিনিস হারাম করে নেয়ার ক্ষেত্রে কসমের কাফ্ফারা না দেয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ঐ জিনিস ব্যবহার করতে পারবে না (বাদায়েউস সানায়ে, হিদায়া, ফাতহুল কাদীর, আহকামুল কুরআন—জাস্সাস)।

শাফেয়ী ফিকাহবিদদের মতে, স্ত্রীকে যদি তালাক কিংবা যিহারের নিয়তে হারাম করা হয়ে থাকে তাহলে যে বিষয়ের নিয়ত করা হবে সেটিই কার্যকর হবে। রিজয়ী তালাকের নিয়ত করলে রিজয়ী তালাক হবে, বায়েন তালাকের নিয়ত করলে বায়েন তালাক হবে এবং যিহারের নিয়ত করলে যিহার হবে। কেউ যদি তালাক ও যিহার উভয়টি নিয়ত করে তাহরীমের শব্দ ব্যবহার করে থাকে তাহলে তাকে দু'টির মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণ করতে বলা হবে। কারণ, তালাক ও যিহার একই সাথে কার্যকরী হতে পারে না। তালাক দ্বারা বিবাহ বন্ধন নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু যিহারের ক্ষেত্রে তা অবশিষ্ট থাকে। কোন নিয়ত ছাড়াই যদি স্ত্রীকে হারাম করে নেয়া হয়ে থাকে তাহলে সে হারাম হবে না। তবে কসমের জন্য অবশ্যই কাফ্ফারা দিতে হবে। আর যদি স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন জিনিস হারাম করে থাকে তাহলে তা একটি অনর্থক কাজ হিসেবে গণ্য হবে। সে জন্য তাকে কোন কাফ্ফারা দিতে হবে না। (মুগনিউল মুহতাজ)

মালেকী ফিকাহবিদদের মতে, কেউ যদি স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন জিনিস হারাম করে নেয় তাহলে তা হারামও হয় না এবং তা ব্যবহার করার পূর্বে কোন কাফ্ফারা দেয়াও

আবশ্যক নয়। তবে কেউ যদি স্ত্রীকে বলে, তুমি হারাম অথবা আমার জন্য হারাম অথবা আমি তোমার জন্য হারাম, সে ক্ষেত্রে সে ঐ স্ত্রীর সাথে যৌন মিলন করে থাক বা না থাক সর্বাবস্থায় তিন তালাক বলে গণ্য হবে। তবে সে যদি তিনের কম সংখ্যক তালাকের নিয়ত করে থাকে তাহলে ভিন্ন কথা। আসবাগ বলেছেন, কেউ যদি এভাবে বলে, আমার জন্য যা হালাল ছিল তা হারাম তাহলে স্ত্রীকে উল্লেখ করে বাদ না দেয়া পর্যন্ত এ কথা দ্বারা অবশ্যই স্ত্রীকে হারাম করে নেয়া বুঝাবে। আল মুদাওয়ানা গ্রন্থে এ ব্যাপারে যৌন মিলন হওয়া এবং যৌন মিলন না হওয়া স্ত্রীর মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। সহবাসকৃত স্ত্রীকে হারাম বলে দেয়ায় নিয়ত যাই থাক না কেন তিন তালাকই হয়ে যাবে। কিন্তু যে স্ত্রীর সাথে সে সহবাস করেনি, তার ক্ষেত্রে কম সংখ্যক তালাকের নিয়ত করা হয়ে থাকলে যে কয়টি তালাকের নিয়ত করা হয়েছে সেই কয়টি তালাকই হবে। আর যদি কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক তালাকের নিয়ত না থাকে তাহলে তিন তালাক হয়ে যাবে। (হাশিয়াতুদ দুসুকী) কাজী ইবনুল আরাবী আহকামুল কুরআন গ্রন্থে এ বিষয়ে ইমাম মালেকের (র) তিনটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। এক, স্ত্রীকে তাহরীম করলে তা এক তালাক বায়েন হয়। দুই, এতে তিন তালাক হয়ে যায়। তিন, সহবাসকৃত স্ত্রীর বেলায় তাহরীম সর্বাবস্থায় তিন তালাক বলে গণ্য হবে। তবে যে স্ত্রীর সাথে সহবাস হয়নি তার বেলায় এক তালাকের নিয়ত থাকলে এক তালাক হবে। তিনি আরো বলেন ঃ সঠিক কথা হলো, স্ত্রীকে তাহরীম করলে শুধু এক তালাক হবে। কারণ, কেউ কেউ যদি হারাম বলার পরিবর্তে তালাক শব্দ ব্যবহার করে এবং কোন সংখ্যার উল্লেখ না করে তাহলেও শুধু এক তালাক হবে।

এ বিষয়ে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) থেকে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। এক, স্ত্রীকে তাহরীম করা অথবা হালালকে নিজের জন্য কেবল হারাম বলে গণ্য করা যিহার। এ ক্ষেত্রে যিহারের নিয়ত থাক বা না থাক তাতে কিছু এসে যায় না। দুই, এটা স্পষ্ট তালাকের ইংগিত। এ ক্ষেত্রে এক তালাকের নিয়ত থাকলেও তিন তালাক হয়ে যাবে। তিন, এটা কসম বলে গণ্য হবে। তবে সে যদি তালাক অথবা যিহারের মধ্যেকার যে কোন একটির নিয়ত করে তাহলে ভিন্ন কথা। কারণ, সে ক্ষেত্রে যেটির নিয়ত করবে সেটিই কার্যকর হবে। এসব উক্তির মধ্যে প্রথম উক্তিটিই হাম্বলী মাযহাবের রায় বলে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। (আল ইনসাফ)

৫. অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের প্রভু এবং সমস্ত কাজকর্মের তত্ত্বাবধায়ক। কিসে তোমাদের কল্যাণ তা তিনিই সবচেয়ে ভাল করে জানেন আর যে আদেশ-নিষেধ তিনি তোমাদের দিয়েছেন তাও সরাসরি হিকমাত তথা গভীর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও যুক্তি নির্ভর। প্রথম কথাটি বলার অর্থ হচ্ছে, তোমরা নিজেরা স্বাধীন নও। বরং তোমরা আল্লাহর বান্দা আর তিনি তোমাদের প্রভু। তাই তাঁর নির্ধারিত পন্থা ও পদ্ধতিতে রদবদল করার অধিকার তোমাদের কারো নেই। তোমাদের কর্তব্য হলো, নিজেদের সব ব্যাপার তাঁর ওপর সোপর্দ করে কেবল তাঁরই আনুগত্য করতে থাকো। দ্বিতীয় কথাটি বলে এ সত্যটি মনমগজে বদ্ধমূল করে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা যেসব পন্থা-পদ্ধতি ও আইন-কানুন নির্ধারিত করে দিয়েছেন তা জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও যুক্তি নির্ভর। তিনি যে জিনিস হালাল করেছেন তা জ্ঞান ও হিকমাতের ভিত্তিতে হালাল করেছেন। আর যে জিনিস হারাম করেছেন তাও জ্ঞান ও হিকমাতের ভিত্তিতেই হারাম করেছেন। এটা কোন খামখেয়ালী নয় যে, তিনি

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ۖ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَٰذَا ۖ قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ۝

(এ ব্যাপারটিও লক্ষণীয় যে,) নবী তাঁর এক স্ত্রীকে গোপনে একটি কথা বলেছিলেন। পরে সেই স্ত্রী যখন (অন্য কারো কাছে) সেই গোপনীয় বিষয়টি প্রকাশ করে দিল এবং আল্লাহ নবীকে এই (গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করার) ব্যাপারটি জানিয়ে দিলেন তখন নবী (ঐ স্ত্রীকে) কিছুটা সাবধান করলেন এবং কিছুটা মাফ করে দিলেন। নবী যখন তাকে (গোপনীয়তা প্রকাশের) এই কথা জানালেন তখন সে জিজ্ঞেস করলো ঃ কে আপনাকে এ বিষয়ে অবহিত করেছে? নবী বললেন ঃ আমাকে তিনি অবহিত করেছেন যিনি সবকিছু জানেন এবং সর্বাধিক অবহিত।[৬]

যুক্তিহীনভাবে যে জিনিসকে ইচ্ছা হালাল করেছেন এবং যে জিনিসকে ইচ্ছা হারাম করেছেন। তাই যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করে তাদের বুঝা উচিত, عليم (মহাজ্ঞানী) ও حكيم (প্রজ্ঞাময় ও কৌশলী) আমরা নই বরং আল্লাহই "আলীম" ও "হাকীম"। তাঁর দেয়া আদেশ-নিষেধের আনুগত্যের মধ্যেই আমাদের কল্যাণ নিহিত।

৬. বিভিন্ন রেওয়ায়াতে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, নবী (সা) অমুক বিষয়টি সম্পর্কে গোপনে তাঁর এক স্ত্রীকে বলেছিলেন এবং সেই স্ত্রী আবার তা অন্য স্ত্রীকে বলেছিলেন। আমাদের মতে, প্রথমত বিষয়টি অনুসন্ধান করে বের করা ঠিক নয়। কারণ, গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করে দেয়ার কারণেই তো আল্লাহ তা'আলা এখানে নবীর (সা) এক স্ত্রীকে তিরস্কার করছেন। তাই তা খুঁজে খুঁজে বরে করা ও প্রকাশ করার চিন্তায় লেগে যাওয়া আমাদের জন্য কি করে ঠিক হবে। দ্বিতীয়ত আয়াতটি যে উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে তার প্রেক্ষিতে বিচার করলে গোপনীয় কথাটি কি ছিল তার আদৌ কোন গুরুত্ব থাকে না। আয়াতের উদ্দেশ্যের সাথে এর কোন সম্পর্ক থাকলে আল্লাহ তা'আলা নিজেই তা বলে দিতেন। মূল যে উদ্দেশ্যের জন্য এ বিষয়টি কুরআন মজীদে বর্ণনা করা হয়েছে তা নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীদের একজনকে তাঁর ভুলের জন্য তিরস্কার করা। তাঁর ভুল হলো, তাঁর মহান ও মর্যাদাবান স্বামী গোপনে তাঁকে যে কথাটি বলেছিলেন তা তিনি গোপন রাখেননি, বরং প্রকাশ করে দিয়েছেন। এটি যদ্রি দুনিয়ার আর দু'দশটি স্বামী স্ত্রীর মধ্যেকার সম্পর্কের মত শুধু একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার হতো তাহলে আল্লাহ তা'আলার সরাসরি অহীর মাধ্যমে নবীকে (সা) তা জানিয়ে দেয়ার কোন প্রয়োজনই ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তা শুধু জানিয়ে দেয়াকেই যথেষ্ট মনে করেননি, বরং তা নিজের সেই কিতাবে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন যা সারা দুনিয়ার মানুষকে চিরদিন পড়তে হবে। কিন্তু এ বিষয়টিকে যে কারণে এরূপ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তাহচ্ছে, তিনি কোন সাধারণ স্বামীর স্ত্রী ছিলেন না। বরং এক মহান ও মর্যাদাবান স্বামীর স্ত্রী ছিলেন যাকে আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত

إِنْ تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ۖ وَإِن تَظَٰهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَىٰهُ وَجِبْرِيلُ وَصَٰلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ ④

তোমরা দু'জন যদি আল্লাহর কাছে তাওবা করো (তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম), কেননা, তোমাদের মন সরল সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছে[৭] আর যদি তোমরা নবীর বিরুদ্ধে পরস্পর সংঘবদ্ধ হও[৮] তা হলে জেনে রাখো, আল্লাহ তার অভিভাবক, তাছাড়া জিবরাঈল, নেক্‌কার ঈমানদারগণ এবং সব ফেরেশতা তার সাথী ও সাহায্যকারী।[৯]

গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের পদমর্যাদায় অভিষিক্ত করেছিলেন। যাঁকে সর্বক্ষণ কাফের, মুশরিক ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে একটি নিরবছিন্ন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হচ্ছিল। যাঁর নেতৃত্বে কুফরী বিধানের স্থলে ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপক চেষ্টা-সাধনা চলছিল। এরূপ মহান ব্যক্তিত্বের ঘরে এমন অসংখ্য কথা হতে পারতো যা গোপন না থেকে যদি আগেভাগেই প্রকাশ হয়ে পড়তো তাহলে তিনি যে মহত কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছিলেন তার ক্ষতি হতে পারত। তাই সেই ঘরের এক মহিলার থেকে যখন প্রথমবারের মত এই দুর্বলতা প্রকাশ পেল যে, তাঁকে গোপনে যে কথাটি বলা হয়েছিল তা তিনি অন্যের কাছে প্রকাশ করে দিলেন (যদিও তিনি অপর কেউ ছিলেন না, বরং নিজ পরিবারেরই একজন সদস্য ছিলেন)। এ কাজের জন্য তৎক্ষণাৎ তাঁকে তিরস্কার করা হলো এবং গোপনেও তাঁকে তিরস্কার করা হয়নি, বরং কুরআন মজীদে প্রকাশ্যে তিরস্কার করা হয়েছে। যাতে শুধু নবীর (সা) স্ত্রীগণকেই নয় বরং মুসলিম সমাজের সমস্ত দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের স্ত্রীদেরকেও গোপনীয় বিষয় সংরক্ষণের প্রশিক্ষণ দেয়া যায়। যে গোপনীয় কথাটি প্রকাশ করে দেয়া হয়েছিল তা বিশেষ কোন গুরুত্ব বহন করতো কিনা এবং তা প্রকাশ হওয়ার কারণে কোন ক্ষতির আশংকা ছিল কিনা আয়াতে সে বিষয়টি একেবারেই উপেক্ষা করা হয়েছে। তিরস্কার করা হয়েছে শুধু এ জন্য যে, গোপনীয় কথা অন্যের কাছে বলে দেয়া হয়েছিল। কারণ, কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তির পরিবারের লোকজনের মধ্যে যদি এরূপ দুর্বলতা বিদ্যমান থাকে যে, তারা গোপনীয় বিষয় সংরক্ষণের ব্যাপারে অবহেলা করেন তাহলে আজ একটি গুরুত্বহীন গোপনীয় বিষয় প্রকাশ হয়ে পড়লে কাল অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ গোপনীয় বিষয়ও প্রকাশ হয়ে যেতে পারে। সমাজে যে ব্যক্তি যত অধিক দায়িত্বশীল পদমর্যাদার অধিকারী হবে তত অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও নাজুক বিষয়াদি তার পরিবারের লোকদের অবগতিতে আসবে। গোপনীয় বিষয়াদি যদি তাদের মাধ্যমে অন্যদের কাছে পৌঁছে যায় তাহলে এই দুর্বলতা যে কোন সময় যে কোন বড় বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

৭. মূল ইবারত হচ্ছে, فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا । صغو আরবী ভাষায় বেঁকে যাওয়া এবং তেড়া হয়ে যাওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। শাহ ওয়ালীউল্লাহ সাহেব এ আয়াতাংশের অনুবাদ করেছেন : هرائيه كج شده استدل شما এবং শাহ

রফীউদ্দীন সাহেব অনুবাদ করেছেন ঃ "তোমাদের অন্তর বাঁকা হয়ে গিয়েছে।" হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), সুফিয়ান সাওরী এবং দাহ্‌হাক এর অর্থ করেছেন زَاغَتْ قُلُوبُكُمَا অর্থাৎ সোজা পথ থেকে তোমাদের মন সরে গিয়েছে। এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম রাযী (র) বলেন ঃ عَدَلَتْ وَمَالَتْ عَنِ الْحَقِّ وَهُوَ حَقُّ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ হক থেকে বিচ্যুত হয়েছে। আর হক অর্থ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হক। আল্লামা আলুসীর ব্যাখ্যা হচ্ছে,

مَالَتْ عَنِ الْوَاجِبِ مِنْ مُوَافِقَتِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُبِّ مَايُحِبُّهُ وَكِرَاهَةِ مَا يَكْرَهُهُ اِلٰى مُخَالِفَتِهِ -

অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা পছন্দ করেন তা পছন্দ করা এবং যা অপছন্দ করেন তা অপছন্দ করার ব্যাপারে তাঁর সাথে মিল রেখে চলা তোমাদের জন্য অবশ্য করণীয়। কিন্তু এ ব্যাপারে তোমাদের মন তাঁর সাথে সাজুয্য রক্ষা করে চলা থেকে বিচ্যুত হয়ে তাঁর বিরোধিতা করার দিকে বেঁকে গিয়েছে।

৮. মূল আয়াতাংশ হচ্ছে وَاِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ । تظاهر অর্থ কারো বিরুদ্ধে পরস্পর সহযোগিতা করা অথবা কারো বিরুদ্ধে বেঁকে বসা। শাহ ওয়ালীউল্লাহ এ আয়াতাংশের অনুবাদ করেছেনঃ اکر بايم متفق شويد بر رنجا يرن يبغمبر "যদি নবীকে কষ্ট দেয়ার জন্য ঐক্যবদ্ধ হও। শাহ্ আবদুল কাদের সাহেবের অনুবাদ হলো ঃ "তোমরা দু'জন যদি তাঁর ওপর চড়াও হও।" মাওলানা আশরাফ আলী সাহেবের অনুবাদ হলো, তোমরা দুইজন যদি নবীর বিরুদ্ধে এভাবেই কাজকর্ম করতে থাক। মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী সাহেব এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ যদি তোমরা দুইজন এভাবে কাজকর্ম করতে এবং ক্ষোভ দেখাতে থাক।"

আয়াতে স্পষ্টভাবে দুইজন মহিলাকে সম্বোধন করা হয়েছে। আয়াতের পূর্বাপর প্রসংগ থেকে জানা যায় যে, ঐ দু'জন মহিলা ছিলেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের পবিত্র স্ত্রীদের অন্তরভুক্ত। কেননা এই সূরার প্রথম আয়াত থেকে পঞ্চম আয়াত পর্যন্ত একাদিক্রমে নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীদের বিষয়াদিই আলোচিত হয়েছে। কুরআন মজীদের বাচনভঙ্গি থেকে এতটুকু বিষয় প্রকাশ পাচ্ছে। এখন প্রশ্ন ঐ দু'জন স্ত্রী ছিলেন কে কে? আর যে কারণে এ তিরস্কার করা হলো সেই বিষয়টিই বা কি ছিল। এ বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা আমরা হাদীস শরীফে দেখতে পাই। মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও নাসায়ী হাদীস গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস কর্তৃক একটি বিস্তারিত বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে যাতে কিছুটা শাব্দিক তারতম্য সহ এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ

আমি অনেক দিন থেকে মনে করছিলাম হযরত উমরকে (রা) জিজ্ঞেস করবো, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের মধ্যে যে দু'জন তাঁর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন এবং যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেছিলেন اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا তারা কে? কিন্তু তার ভয়াল

ব্যক্তিত্বের কারণে আমার সে সাহস হতো না। শেষ পর্যন্ত হজ্জে গেলে আমিও তাঁর সাথে গেলাম। ফিরে আসার সময় পথিমধ্যে এক জায়গায় তাঁকে অযু করানোর সময় আমি সুযোগ পেয়ে গেলাম এবং বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। জবাবে তিনি বললেন ঃ তাঁরা ছিলেন হযরত আয়েশা (রা) এবং হাফসা (রা)। তারপর তিনি বলতে শুরু করলেন, আমরা কুরাইশীরা আমাদের স্ত্রীদেরকে দমিয়ে রাখতে অভ্যস্ত ছিলাম। আমরা মদীনায় আসলে এখানে এমন অনেক লোক পেলাম যাদের স্ত্রীরা তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে ছিল। ফলে আমাদের স্ত্রীরাও তাদের থেকে এ শিক্ষা গ্রহণ করতে শুরু করলো। একদিন আমি আমার স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হলে বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলাম যে, সে–ও আমাকে পাল্টা জবাব দিচ্ছে (মূল ভাষা হচ্ছে فاذا هى تراجعنى)। সে আমার কথার প্রত্যুত্তর করলো—এটা আমার অত্যন্ত খারাপ লাগলো। সে বললো ঃ আমি আপনার কথার প্রত্যুত্তর করছি তাতে আপনি রাগান্বিত হচ্ছেন কেন? আল্লাহর শপথ! রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ তো তাঁকে কথায় কথায় জবাব দিয়ে থাকেন(মূল ভাষা হচ্ছে ليراجعنه)। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার নবীর (সা) প্রতি সারা দিন অসন্তুষ্ট থাকেন (বুখারীর বর্ণনায় আছে নবী (সা) সারা দিন তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন)। এ কথা শুনে আমি বাড়ী থেকে বের হলাম এবং হাফসার (রা) কাছে গেলাম [হযরত উমরের (রা) কন্যা এবং নবীর (সা) স্ত্রী।] আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ তুমি কি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথার প্রত্যুত্তর করো? সে বললো ঃ হাঁ। আমি আরো জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের মধ্যে কেউ কি সারাদিন নবীর (সা) প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে? [বুখারীর বর্ণনা হচ্ছে, নবী (সা) সারা দিন তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন।] সে বললো ঃ হাঁ। আমি বললাম ঃ তোমাদের মধ্য থেকে যে মহিলা এরূপ করে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তোমাদের মন থেকে কি এ ভয় দূর হয়ে গিয়েছে যে, আল্লাহর রসূলের অসন্তুষ্টির কারণে আল্লাহও তার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন এবং সে ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত হবে? কখনো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথার প্রত্যুত্তর করবে না। (এখানেও একই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে لا تراجعى) এবং তাঁর কাছে কোন জিনিসের দাবীও করবে না। আমার সম্পদ থেকে যা ইচ্ছা তুমি চেয়ে নিও। তোমার সতীন [অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রা)] তোমার চাইতে অধিক সুন্দরী এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অধিক প্রিয়। তাঁর কারণে তুমি আত্মপ্রতারিত হয়ো না। এরপর আমি সেখানে থেকে বের হয়ে উম্মে সালামার (রা) কাছে গেলাম এবং এ ব্যাপারে তাঁর সাথে কথা বললাম। তিনি ছিলেন আমার আত্মীয়া। তিনি আমাকে বললেন ঃ খাত্তাবের বেটা; তুমি তো দেখছি অদ্ভুত লোক! প্রত্যেক ব্যাপারে তুমি হস্তক্ষেপ করছ! এমন কি এখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর স্ত্রীদের ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করতে চলেছ। তাঁর এই কথায় আমি সাহস হারিয়ে ফেললাম। এরপর হঠাৎ আমার এক আনসার প্রতিবেশী রাত্রি বেলায় আমার বাড়ীতে এসে আমাকে ডাকলেন। আমরা দু'জন পালা করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে হাজির হতাম এবং যার পালার দিন যে কথা হতো তা একে অপরকে বলতাম। এই সময়টা ছিল এমন যখন আমাদের বিরুদ্ধে গাসসানীদের আক্রমণের বিপদাশংকা দেখা দিয়েছিল। তার আহবানে আমি বের হলে সে বলল ঃ একটি মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ গাস্সানীরা কি আক্রমণ করে বসেছে? সে বলল ঃ না তার চেয়েও বড় ঘটনা ঘটেছে। রসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন। আমি বললাম ঃ হাফসা ব্যর্থ ও ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। বুখারীর ভাষা হচ্ছেঃ رغم انف حفصة وعائشة এমনটা ঘটবে বলে আমি প্রথমেই আশংকা করেছিলাম।

কাহিনীর পরবর্তী অংশ আমরা উল্লেখ করলাম না। এ অংশে হযরত উমর (রা) বলেছেন ঃ তিনি পরদিন সকালে নবীর (সা) খেদমতে হাজির হয়ে কিভাবে তাঁর ক্রোধ নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছেন। আমরা মুনসাদে আহমাদ ও বুখারীর বর্ণিত হাদীসসমূহ একত্রিত করে এ কাহিনী বিন্যস্ত করেছি। এতে হযরত উমর (রা) যে مراجعت শব্দ ব্যবহার করেছেন এখানে তার আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে না। বরং পূর্বাপর বিষয় থেকে আপনাআপনি প্রকাশ পায় যে, এ শব্দটি প্রতি উত্তর বা কথার পৃষ্ঠে কথা বলা অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে এবং হযরত উমরের (রা) তাঁর কন্যাকে لا تراجعى رسول الله বলাটা স্পষ্টত এ অর্থে বলা হয়েছে যে, নবীর (সা) সাথে বাদানুবাদ করো না। কেউ কেউ এই অনুবাদকে ভুল বলে থাকেন। তাদের আপত্তি হচ্ছে, مراجعت শব্দের অর্থ পাল্টা জবাব দেয়া অথবা কথার পৃষ্ঠে কথা বলা ঠিক, কিন্তু বাদানুবাদ করা ঠিক নয়। কিন্তু আপত্তিকারী এ ব্যক্তিবর্গ এ বিষয়টি উপলব্ধি করেন না যে, কম মর্যাদার লোক যদি তার চেয়ে বড় মর্যাদার ব্যক্তিকে পাল্টা জবাব দেয় কিংবা কথার পৃষ্ঠে কথা বলে তাহলে তাকেই বাদানুবাদ করা বলে। উদাহরণ স্বরূপ, বাপ যদি ছেলেকে কোন কারণে তিরস্কার বা শাসন করে অথবা তাঁর কোন কাজে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে আর ছেলে যদি তাতে আদবের সাথে চুপ থাকা বা ওজর পেশ করার পরিবর্তে পাল্টা জবাব দিতে থাকে, তাহলে একে বাদানুবাদ ছাড়া আর কিছু বলা যেতে পারে না। কিন্তু ব্যাপারটা যখন বাপ এবং ছেলের মধ্যেকার না হয়ে বরং আল্লাহর রসূল এবং তাঁর উম্মাতের কোন লোকের মধ্যেকার ব্যাপার হয় তাহলে একজন নির্বোধই কেবল এ কথা বলতে পারে যে, এটা বাদানুবাদ নয়।

আমাদের এই অনুবাদকে কিছু লোক বেআদবী বা অশিষ্টতা বলে আখ্যায়িত করে। অথচ তা বেআদবী কেবল তখনই হতো যদি আমরা হযরত হাফসা (রা) সম্পর্কে নিজের পক্ষ থেকে এ ধরনের ভাষা প্রয়োগ করার দুঃসাহস দেখাতাম। আমরা তো হযরত উমরের (রা) কথার সঠিক অর্থ তুলে ধরেছি। আর তিনি তাঁর মেয়েকে তার ত্রুটির জন্য তিরস্কার করতে গিয়ে এ কথাটি বলেছেন। একে বেআদবী বলার অর্থ হচ্ছে, হয় পিতাও তার নিজের মেয়েকে শাসন বা তিরস্কারের সময় আদবের সাথে কথা বলবে অথবা তার তিরস্কার মিশ্রিত ভাষার অনুবাদকারীর নিজের পক্ষ থেকে তাকে মার্জিত ও শিষ্ট ভাষা বানিয়ে দেবে।

এ ক্ষেত্রে সত্যিকার ভেবে দেখার বিষয় হচ্ছে, ব্যাপারটা যদি এ রকম হালকা ও মামুলী ধরনের হতো যে, নবী (সা) তাঁর স্ত্রীদের কিছু বললে তাঁরা পাল্টা তার জবাব দিতেন, তাহলে তাকে এতো গুরুত্ব কেন দেয়া হলো যে, কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা নিজে সরাসরি নবীর (সা) ঐ স্ত্রীদেরকে কঠোরভাবে সতর্ক করে দিলেন? আর হযরত উমরই (রা) বা এ বিষয়টিকে এত মারাত্মক মনে করলেন কেন যে, প্রথমে নিজের মেয়েকে তিরস্কার করলেন এবং তার পর এক এক করে নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীগণের

عَسٰى رَبُّهٗۤ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗۤ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَّاَبْكَارًا ۝

নবী যদি তোমাদের মত সব স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেন তাহলে অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পরিবর্তে তাকে এমন সব স্ত্রী দান করবেন যারা তোমাদের চেয়ে উত্তম হবে।[১০] সত্যিকার মুসলমান, ঈমানদার,[১১] অনুগত,[১২] তাওবাকারিনী,[১৩] ইবাদাত গোজার[১৪] এবং রোযাদার।[১৫] তারা পূর্বে বিবাহিত বা কুমারী যাই হোক না কেন।

প্রত্যেকের ঘরে গিয়ে তাঁদেরকে আল্লাহর অসন্তুষ্টির ভয় দেখিয়ে সাবধান করলেন। সবচেয়ে বড় কথা হলো, তাঁর মতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি এমন চড়া মেজাজের ছিলেন যে, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারেও স্ত্রীদের প্রতি অসন্তুষ্ট হতেন? তাছাড়া (মা'য়াযাল্লাহ) তাঁর দৃষ্টিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেজাজ এতই কঠোর ছিল যে, এ ধরনের কথায় অসন্তুষ্ট হয়ে তিনি একবার সব স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাঁর নিজের কুঠরিতে নির্জন জীবন গ্রহণ করেছিলেন, কেউ যদি এসব প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে তাহলে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সে অবশ্যই দু'টি পথের যে কোন একটি গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। হয় তার কাছে নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীদের সম্মান ও মর্যাদার বিষয় এত বড় হয়ে দেখা দেবে যে, সে এ জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দোষ-ত্রুটিরও পরোয়া করবে না। অথবা সোজাসুজি এ কথা মেনে নিতে হবে যে, সেই সময় নবীর (সা) ঐ সব পবিত্র স্ত্রীদের আচরণ প্রকৃতই এমন আপত্তিকর হয়ে গিয়েছিল যে, তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়ার ব্যাপারে রসূলের ভূমিকা ন্যায়সংগত ছিল এবং তাঁর চেয়ে অধিক ন্যায়সংগত ছিল আল্লাহ তা'আলার ভূমিকা যে কারণে নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীদের এই আচরণ সম্পর্কে কঠোর সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন।

৯. অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে জোট পাকিয়ে তোমরা কেবল নিজের ক্ষতিই ডেকে আনবে। কারণ আল্লাহ যাঁর প্রভু এবং জিবরাঈল, সমস্ত ফেরেশতা ও সৎকর্মশীল ঈমানদারগণ যার সংগী ও সহযোগী তাঁর বিরুদ্ধে জোট পাকিয়ে কেউ-ই সফলতা লাভ করতে পারে না।

১০. এ থেকে জানা যায় যে, হযরত আয়েশা (রা) এবং হাফসাই (রা) শুধু ভুল করেছিলেন না বরং নবীর (সা) অন্য স্ত্রীগণও কিছু না কিছু ভুল করেছিলেন। এ কারণেই আয়াতে তাঁদের দু'জনকে ছাড়াও নবীর (সা) অন্যসব স্ত্রীদেরকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে। এসব ভুল আচরণের ধরন সম্পর্কে কুরআন মজীদে কোন প্রকার আলোকপাত করা হয়নি। তবে এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে কিছু বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। এখানে আমরা তা উদ্ধৃত করলাম ঃ

বুখারীতে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উমর (রা) বলেছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের পারস্পরিক ঈর্ষা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা নবীকে (সা) অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। হাদীসের মূল ভাষা হচ্ছেঃ اِجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ । তাই আমি তাঁদের বললাম ঃ নবী (সা) যদি তোমাদের তালাক দিয়ে দেন তাহলে আল্লাহ তা'আলার তাঁকে তোমাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী দান করা অসম্ভব নয়। হযরত আনাসের (রা) বরাত দিয়ে ইবনে আবী হাতেম হযরত উমরের (রা) বর্ণনা নিম্নোক্ত ভাষায় উদ্ধৃত করেছেন ঃ আমার কাছে এ মর্মে খবর পৌছল যে, নবী (সা) ও উম্মুল মু'মিনীনদের মধ্যে কিছুটা তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে। এ কথা শুনে আমি তাঁদের প্রত্যেকের কাছে গিয়ে বললাম ঃ তোমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অতিষ্ঠ করা থেকে বিরত থাক। তা না হলে আল্লাহ তা'আলা নবীকে (সা) তোমাদের পরিবর্তে উত্তম স্ত্রী দান করবেন। এমনকি আমি যখন উম্মুল মু'মিনীনদের মধ্যে শেষ জনের কাছে গেলাম [বুখারীর একটি হাদীসের বর্ণনা অনুসারে তিনি ছিলেন হযরত উম্মে সালামা (রা)] তখন তিনি আমাকে বললেন ঃ হে উমর! রসূলুল্লাহ কি স্ত্রীদেরকে উপদেশ দেয়ার জন্য যথেষ্ট নন যে, তুমি তাঁদেরকে উপদেশ দিতে চলেছ? এতে আমি চুপ হয়ে গেলাম। অতপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করলেন।

মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত উমর (রা) তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা) যখন সাময়িকভাবে তাঁর স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা বন্ধ করলেন তখন আমি মসজিদে নববীতে পৌছে দেখলাম লোকজন চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে বসে নুড়িপাথর তুলছে এবং নিক্ষেপ করছে এবং পরস্পর বলাবলি করছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন। এরপর হযরত উমর (রা) হযরত আয়েশা (রা) ও হাফসার কাছে তাঁর যাওয়ার এবং তাঁদের উপদেশ দেয়ার কথা উল্লেখ করলেন। তারপর বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলাম, স্ত্রীদের ব্যাপারে আপনি চিন্তিত হচ্ছেন কেন? আপনি যদি তাঁদের তালাক দেন তাহলে আল্লাহ তা'আলা আপনার সাথে আছেন, সমস্ত ফেরেশতা, জিবরাঈল ও মিকাঈল আপনার সাথে আছেন, আর আমি, আবু বকর এবং সমস্ত ঈমানদার আপনার সাথে আছেন। আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। কারণ, খুব কমই এ রকম হয়েছে যে, আমি কোন কথা বলেছি এবং আল্লাহ তা'আলা তা সত্যায়ন ও সমর্থন করবেন বলে আশা করি নাই। বস্তুত এরপর সূরা তাহরীমের এ আয়াতগুলো নাযিল হয়। এরপর আমি নবীকে (সা) জিজ্ঞেস করলাম। আপনি স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন? তিনি বললেন, না। এ কথা শুনে মসজিদে নববীর দরজায় দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে ঘোষণা করলাম যে, নবী (সা) তাঁর স্ত্রীদের তালাক দেন নাই।

বুখারীতে হযরত আনাস (রা) থেকে এবং মুসনাদে আহমাদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), হযরত আয়েশা (রা) এবং হযরত আবু হুরাইরা থেকে এ বিষয়ে বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা) এক মাস পর্যন্ত তাঁর স্ত্রীদের থেকে আলাদা থাকার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এবং নিজের কুঠরিতে অবস্থান করতে শুরু করেছিলেন। ২৯ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এসে বললেন ঃ আপনার কসম পূরণ হয়েছে, মাস পূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

হাফেজ বদরুদ্দীন আইনী উমদাতুল কারী গ্রন্থে হযরত আয়েশার (রা) বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীগণের মধ্যে দু'টি দলের সৃষ্টি হয়েছিল। একটিতে ছিলেন হযরত আয়েশা (রা), হযরত হাফসা (রা), হযরত সাওদা (রা) ও হযরত সাফিয়া (রা)। আর অপরটিতে ছিলেন হযরত যয়নাব, হযরত উম্মে সালামা এবং অবশিষ্ট উম্মুল মু'মিনীনগণ।

ঐ সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পারিবারিক জীবনে কি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল এসব বর্ণনা থেকে তা কিছুটা আন্দাজ করা যেতে পারে। তাই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হস্তক্ষেপ করে নবীর (সা) স্ত্রীদের কর্মপদ্ধতি ও আচরণ সংশোধন করা জরুরী হয়ে পড়েছিল। নবীর (সা) স্ত্রীগণ যদিও সমাজের মহিলাদের মধ্যে সর্বোত্তম মহিলা ছিলেন, তথাপি তাঁরা ছিলেন মানুষ। তাই তাঁরা মানসিক চাহিদা ও দুর্বলতা থেকে মুক্ত ছিলেন না। নিরবচ্ছিন্নভাবে কষ্টকর জীবন যাপন কোন কোন সময় তাঁদের জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত। তাই তাঁরা অধৈর্য হয়ে নবীর (সা) কাছে খোরপোষের দাবী করতে শুরু করতেন। এ অবস্থায় সূরা আহযাবের ২৮—২৯ আয়াত নাযিল করে আল্লাহ তা'আলা তাঁদের উপদেশ দিয়েছেন যে, পার্থিব স্বাচ্ছন্দই যদি তোমাদের কাম্য হয়ে থাকে তাহলে আমার রসূল তোমাদেরকে উত্তম পন্থায় বিদায় দিয়ে দেবেন। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং আখেরাতের জীবন কামনা করো তাহলে রসূলের সাহচর্যে থাকার কারণে যেসব দুঃখ কষ্ট আসবে তা বরদাশত করো (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আহযাব, টীকা-৪১ এবং সূরা আহযাবের ভূমিকা)। তাছাড়া কোন কোন সময় নারী প্রকৃতির কারণে তাদের থেকে স্বভাবতই এমনসব বিষয় প্রকাশ পেত যা সাধারণ মানবীয় বৈশিষ্টের পরিপন্থী ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে যে ঘরের স্ত্রী হওয়ার মর্যাদা দান করেছিলেন তার মর্যাদা ও গৌরব এবং মহান দায়িত্ব ও কর্তব্যের সাথে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। এসব কারণে যখন এ আশংকা দেখা দিল যে তা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পারিবারিক জীবনকে বিষিয়ে তুলতে পারে এবং আল্লাহ তা'আলা নবীর(সা) দ্বারা যে মহত কাজ আঞ্জাম দিচ্ছিলেন তার ওপর এর প্রভাব পড়তে পারে, তাই কুরআন মজীদের এ আয়াত নাযিল করে তাঁদের সংশোধন করলেন। যাতে তাঁর পবিত্র স্ত্রীদের মধ্যে সেই মর্যাদা ও দায়িত্বানুভূতি সৃষ্টি হয় যা তাঁরা আল্লাহর সর্বশেষ রসূলের জীবন সঙ্গিনী হওয়ার কারণে লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। আর তাঁরা যেন নিজেদেরকে সাধারণ নারীদের মত এবং নিজেদের পরিবারকে সাধারণ পরিবারসমূহের মত মনে করে না বসেন। এ আয়াতের প্রথম অংশটিই এমন যা শুনে হয়তো নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীদের হৃদয়-মন কেঁপে উঠে থাকবে। তাঁদের জন্য এ কথাটির চেয়ে বড় হুঁশিয়ারী আর কি হবে যে, নবী যদি তোমাদের তালাক দেন তাহলে আল্লাহর তাঁকে তোমাদের পরিবর্তে উত্তম স্ত্রী দান করাটা অসম্ভব নয়। প্রথমত নবীর (সা) কাছে থেকে তালাক পাওয়ার চিন্তা বা কল্পনাই তাঁদের কাছে অসহনীয় ব্যাপার। তাছাড়া আরো বলা হয়েছে যে, উম্মুল মু'মিনীন হওয়ার মর্যাদা তোমাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে এবং অন্য যেসব নারীকে আল্লাহ তা'আলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের স্ত্রী হিসেবে আনবেন তারা তোমাদের চেয়ে উত্তম হবেন। এরপরে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তিরস্কারযোগ্য হতে পারে এমন কোন কাজ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীদের দ্বারা সংঘটিত হওয়া সম্ভবই ছিল না।

এ কারণে আমরা কুরআন মজীদে শুধু দু'টি যায়গায় এমন দেখতে পাই যেখানে মহা সম্মানিত এই নারীদেরকে হুঁশিয়ারী দেয়া হয়েছে। উক্ত জায়গা দু'টির একটি সূরা আহযাবে এবং অপরটি সূরা তাহরীমে।

১১. মুসলিম এবং মু'মিন শব্দ এক সাথে ব্যবহৃত হলে মুসলিম শব্দের অর্থ হয় কার্যত আল্লাহর হুকুম আহকাম অনুযায়ী আমলকারী ব্যক্তি এবং মু'মিন অর্থ হয় এমন ব্যক্তি যে সরল মনে ইসলামী আকীদা বিশ্বাসকে গ্রহণ করেছে। অতএব, সর্বোত্তম মুসলমান স্ত্রীর প্রাথমিক বৈশিষ্ট হচ্ছে, সে সরল মনে আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর দীনের প্রতি ঈমান পোষণ করে এবং নিজের চরিত্র, অভ্যাস, স্বভাব ও আচরণে আল্লাহর দীনের অনুসারী হয়।

১২. এর দু'টি অর্থ এবং দু'টি অর্থই এখানে প্রযোজ্য। এক, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুগত। দুই, স্বামীর অনুগত।

১৩. تائب (তাওবাকারী) শব্দটি যখন মানুষের বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন তা শুধু একবার মাত্র তওবাকারীকে বুঝায় না। বরং তা এমন ব্যক্তিকে বুঝায়, যে নিজের অপরাধ ও ভুল-ত্রুটির জন্য আল্লাহর কাছে সদাসর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে, যার বিবেক জীবন্ত ও সচেতন, যার মধ্যে সবসময় নিজের দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতির অনুভূতি জাগ্রত থাকে এবং সে জন্য সে লজ্জিত ও অনুতপ্ত থাকে। এ প্রকৃতির মানুষের মধ্যে কোন সময় গর্ব, অহংকার, অহমিকা বা আত্মতুষ্টির অনুভূতি সৃষ্টি হয় না। স্বভাবগতভাবে সে হয় নম্র মেজাজ এবং সহিষ্ণু ও উদার।

১৪. ইবাদাতকারী ব্যক্তি কোন অবস্থায় কখনো সেই ব্যক্তির মত আল্লাহ সম্পর্কে গাফিল হতে পারে না যে আল্লাহর ইবাদাত করে না। কোন নারীকে উত্তম স্ত্রী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এ জিনিসটারও বিরাট ভূমিকা রয়েছে। ইবাদাত গোজার হওয়ার কারণে সে হুদূদুল্লাহ বা আল্লাহর নির্ধারিত সীমাসমূহ মেনে চলে, হকদারদের হক আদায় করে, তার ঈমান সবসময় জীবন্ত ও সতেজ থাকে, সে আল্লাহর হুকুম আহকাম পালন করা থেকে বিরত হবে না—এটাই তার কাছে আশা করা যায়।

১৫. মূল ব্যবহৃত শব্দ হচ্ছে سائحات । কয়েকজন সাহাবী থেকে বহু সংখ্যক তাবেয়ী এর অর্থ বর্ণনা করেছেন صائمات (রোযাদার)। যে সম্পর্কের কারণে سياحت শব্দ রোযা অর্থে ব্যবহৃত হয় তা হচ্ছে, প্রাচীনকালে পুরোহিত এবং দরবেশরাই বেশী বেশী ভ্রমণ করতো। ভ্রমণের সময় তাদের কাছে কোন পাথেয় থাকত না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যতক্ষণ কোথাও থেকে কোন খাদ্য না পাওয়া যেতো ততক্ষণ তাদেরকে অভুক্ত থাকতে হতো। এদিক দিয়ে বিচার করলে রোযাও এক ধরনের দরবেশী। কারণ ইফতারের সময় না হওয়া পর্যন্ত রোযাদারও অভুক্ত থাকে। ইবনে জারীর সূরা তাওবার ১২ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আয়েশার (রা) একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, سياحة هذه الامة الصيام রোযা এই উম্মাতের سياحت (অর্থাৎ দরবেশী) এ ক্ষেত্রে সৎকর্মশীল স্ত্রীদের প্রশংসায় তাদের রোযাদারীর কথা উল্লেখ করার অর্থ শুধু এ নয় যে, তারা রমজানের ফরয রোযা রাখে বরং এর অর্থ হচ্ছে, তারা ফরয রোযা ছাড়াও নফল রোযাও রেখে থাকে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۝٦ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَا تَعْتَذِرُوا۟ ٱلْيَوْمَ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝٧

হে লোকজন যারা ঈমান এনেছো, তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার ও সন্তান–সন্ততিকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো মানুষ এবং পাথর হবে যার জ্বালানী।[১৬] সেখানে রুঢ় স্বভাব ও কঠোর হৃদয় ফেরেশতারা নিয়োজিত থাকবে যারা কখনো আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে না এবং তাদেরকে যে নির্দেশ দেয়া হয় তাই পালন করে[১৭] (তখন বলা হবে,) হে কাফেরগণ! আজ ওযর প্রকাশ করো না। তোমরা যেমন আমল করছিলে তেমনটি প্রতিদানই দেয়া হচ্ছে।[১৮]

"নবী (সা) যদি তোমাদের তালাক দেন তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পরিবর্তে তাঁকে এমনসব স্ত্রী দান করবেন যাদের মধ্যে অমুক অমুক গুণাবলী থাকবে।" নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীগণকে উদ্দেশ করে আল্লাহ তা'আলার এ কথা বলার অর্থ এ নয় যে, তাদের মধ্যে এসব গুণাবলী ছিল না। বরং এর অর্থ হলো, তোমাদের ত্রুটিপূর্ণ আচরণের কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে কষ্ট হচ্ছে তোমরা তা পরিত্যাগ করো এবং তার পরিবর্তে তোমাদের মধ্যে এসব গুণাবলী পূর্ণাঙ্গরূপে সৃষ্টির জন্য একান্তভাবে মনোনিবেশ করো।

১৬. এ আয়াত থেকে প্রকাশ পায় যে, আল্লাহর আযাব থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য প্রচেষ্টা চালানোর মধ্যেই কোন মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য সীমাবদ্ধ নয়। বরং প্রকৃতির বিধান যে পরিবারটির নেতৃত্বের বোঝা তার কাঁধে স্থাপন করেছে তার সদস্যরা যাতে আল্লাহর প্রিয় মানুষরূপে গড়ে উঠতে পারে সাধ্যমত সে শিক্ষা দীক্ষা দেয়াও তার কাজ। তারা যদি জাহান্নামের পথে চলতে থাকে তাহলে যতটা সম্ভব তাদেরকে সে পথ থেকে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা করবে। তার সন্তান–সন্ততি পৃথিবীতে সুখী হোক তার শুধু এই চিন্তা হওয়া উচিত নয়। বরং এর চেয়েও তার বড় চিন্তা হওয়া উচিত এই যে, তারা যেন আখেরাতে জাহান্নামের ইন্ধন না হয়। বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা প্রত্যেকেই রাখাল এবং তাকে তার অধীনস্ত লোকদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। শাসকও রাখাল। তাকে তার অধীনস্ত লোকদের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। নারী তার স্বামীর

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۖ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑧

২ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর কাছে তাওবা করো, প্রকৃত তাওবা।[১৯] অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তোমাদের দোষত্রুটিসমূহ দূর করে দিবেন এবং এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশ দিয়ে ঝরণাসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে।[২০] সেটি হবে এমন দিন যেদিন আল্লাহ তাঁর নবী এবং নবীর সঙ্গী ঈমানদারদের লাঞ্ছিত করবেন না।[২১] তাদের 'নূর' তাদের সামনে ও ডান দিকে দ্রুত অগ্রসর হতে থাকবে এবং তারা বলতে থাকবে, হে আমাদের রব, আমাদের জন্য আমাদের 'নূর' পূর্ণাঙ্গ করে দাও ও আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। তুমি সব কিছু করতে সক্ষম।[২২]

বাড়ী এবং তার সন্তান–সন্ততির তত্ত্বাবধায়িকা তাকে তাদের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।

পাথর হবে জাহান্নামের জ্বালানী। এর অর্থ পাথরের কয়লা। [ইবনে মাসউদ (রা), ইবনে আব্বাস (রা), মুজাহিদ (রা), ইমাম বাকের (র) ও সুদ্দীর মতে, এর অর্থ গন্ধকের পাথর।]

১৭. অর্থাৎ কোন অপরাধীকে যে কোন শাস্তি দেয়ার নির্দেশই তাদের দেয়া হবে তা তারা হুবহু কার্যকরী করবে এবং কোন প্রকার দয়া মায়া দেখাবে না।

১৮. এ দু'টি আয়াতের বাচনভঙ্গির মধ্যে মুসলমানদের জন্য কঠোর হুঁশিয়ারী বিদ্যমান। প্রথম আয়াতে মুসলমানদেরকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে, নিজেকে এবং নিজের পরিবার পরিজনকে এই ভয়ানক আযাব থেকে রক্ষা করো। দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, জাহান্নামে শাস্তি দিতে গিয়ে কাফেরদেরকে এ কথাটি বলা হবে। এভাবে স্বতঃই যে বিষয়টি প্রতিভাত হয় তা হচ্ছে, পৃথিবীতে মুসলমানদেরকে জীবনযাপনে এমন পদ্ধতি গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে যার কারণে আখেরাতে তাদের পরিণাম কাফেরদের সাথে যুক্ত হবে।

১৯. মূল আয়াতে تَوْبَةً نَّصُوحًا শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় نصح শব্দের অর্থ নিষ্কলুষতা ও কল্যাণকামিতা। খাঁটি মধু যা মোম ও অন্যান্য আবর্জনা থেকে মুক্ত

করা হয়েছে তাকে আরবীতে عسل ناصح বলা হয়। ছেঁড়া কাপড় সেলাই করে দেয়া এবং ফাঁটা ফাঁটা কাপড় ঠিক করে দেয়া বুঝাতে আরবী نصاحة الثوب শব্দ ব্যবহার করা হয়। অতএব, তাওবা শব্দের সাথে نصوح বিশেষণ যুক্ত করলে হয় তার আভিধানিক অর্থ হবে এমন তাওবা যার মধ্যে প্রদর্শনী বা মুনাফিকীর লেশমাত্র নেই। অথবা তার অর্থ হবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজের কল্যাণ কামনা করবে এবং গোনাহ থেকে তাওবা করে নিজেকে মন্দ পরিণাম থেকে রক্ষা করবে। অথবা তার অর্থ হবে গোনাহর কারণে তার দীনদারীর মধ্যে যে ফাটল সৃষ্টি হয়েছে তাওবা দ্বারা তা সংশোধন করবে। অথবা সে তাওবা করে নিজের জীবনকে এমন সুন্দর করে গড়ে তুলবে যে, অন্যের জন্য সে উপদেশ গ্রহণের কারণ হবে এবং তাকে দেখে অন্যরাও তার মত নিজেদেরকে সংশোধন করে নেবে। 'তাওবায়ে নাসূহ'–এর আভিধানিক অর্থ থেকে এ অর্থসমূহই প্রতিভাত হয়। এরপর অবশিষ্ট থাকে তাওবায়ে নাসূহ এর শরয়ী অর্থ। আমরা এর শারয়ী অর্থের ব্যাখ্যা পাই যির ইবনে হুবাইশের মাধ্যমে ইবনে আবী হাতেম কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে। যির ইবনে হুবাইশ বলেন ঃ আমি উবাই ইবনে কা'বের (রা) কাছে 'তাওবায়ে নাসূহ'–এর অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একই প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বললেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে, কখনো তোমার দ্বারা কোন অপরাধ সংঘটিত হলে তুমি নিজের গোনাহর জন্য লজ্জিত হবে। তারপর লজ্জিত হয়ে সে জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং ভবিষ্যতে আর কখনো ঐ কাজ করো না। হযরত উমর (রা), হযরত আবদুল্লাহ (রা) ইবনে মাসউদ এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও এ অর্থই উদ্ধৃত হয়েছে। অন্য একটি বর্ণনা অনুসারে হযরত উমর (রা) 'তাওবায়ে নাসূহা'র সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে ঃ তাওবার পরে পুনরায় গোনাহ করা তো দূরের কথা তা করার আকাংখা পর্যন্ত করবে না (ইবনে জারীর)। হযরত আলী (রা) একবার এক বেদুঈনকে মুখ থেকে ঝটপট করে তাওবা ও ইসতিগফারের শব্দ উচ্চারণ করতে দেখে বললেন, এতো মিথ্যাবাদীদের তাওবা। সে জিজ্ঞেস করলো, তাহলে সত্যিকার তাওবা কি? তিনি বললেন ঃ সত্যিকার তাওবার সাথে ছয়টি জিনিস থাকতে হবে। (১) যা কিছু ঘটেছে তার জন্য লজ্জিত হও। (২) নিজের যে কর্তব্য ও করণীয় সম্পর্কে গাফলতি করছ তা সম্পাদন কর। (৩) যার হক নষ্ট করেছ তা ফিরিয়ে দাও।(৪) যাকে কষ্ট দিয়েছ তার কাছে মাফ চাও। (৫) প্রতিজ্ঞা করো ভবিষ্যতে এ গোনাহ আর করবে না এবং (৬) নফসকে এতদিন পর্যন্ত যেভাবে গোনাহর কাজে অভ্যস্ত করেছ ঠিক তেমনি আল্লাহর আনুগত্যে নিয়োজিত কর। এতদিন পর্যন্ত নফসকে যেভাবে আল্লাহর অবাধ্যতার মজায় নিয়োজিত রেখেছিলে এখন তাকে তেমনি আল্লাহর আনুগত্যের তিক্ততা আস্বাদন করাও (কাশ্‌শাফ)।

তাওবা সম্পর্কিত বিষয়ে আরো কয়েকটি জিনিস ভালভাবে বুঝে নেয়া দরকার। প্রথমত, প্রকৃতপক্ষে তাওবা হচ্ছে কোন গোনাহর কারণে এ জন্য লজ্জিত হওয়া যে, তা আল্লাহর নাফরমানী। কোন গোনাহর কাজ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অথবা বদনামের কারণ অথবা আর্থিক ক্ষতির কারণ হওয়ায় তা থেকে বিরত থাকার সংকল্প করা তাওবার সংজ্ঞায় পড়ে না। দ্বিতীয়ত, যখনই কেউ বুঝতে পারবে যে, তার দ্বারা আল্লাহর নাফরমানী হয়েছে, তার উচিত তৎক্ষণাৎ তাওবা করা এবং যেভাবেই হোক অবিলম্বে তার ক্ষতিপূরণ করা কর্তব্য, তা এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। তৃতীয়ত, তাওবা করে বারবার তা

ভঙ্গ করা, তাওবাকে খেলার বস্তু বানিয়ে নেয়া এবং যে গোনাহ থেকে তাওবা করা হয়েছে বার বার তা করতে থাকা তাওবা মিথ্যা হওয়ার প্রমাণ। কেননা, তাওবার প্রাণ সত্তা হচ্ছে কৃত গোনাহ সম্পর্কে লজ্জিত হওয়া কিন্তু বার বার তাওবা ভঙ্গ করা প্রমাণ করে যে, তার মধ্যে লজ্জার অনুভূতি নেই। চতুর্থত, যে ব্যক্তি সরল মনে তাওবা করে পুনরায় ঐ গোনাহ না করার সংকল্প করেছে মানবিক দুর্বলতার কারণে যদি পুনরায় তার দ্বারা সেই গোনাহর পুনরাবৃত্তি ঘটে তাহলে এ ক্ষেত্রে পূর্বের গোনাহ পুনরুজ্জীবিত হবে না তবে পরবর্তী গোনাহর জন্য তার পুনরায় তাওবা করা উচিত এবং ভবিষ্যতে সে আর তাওবা ভঙ্গ করবে না, এ ব্যাপারে কঠোর সংকল্প করা উচিত। পঞ্চমত, যখনই গোনাহর কথা মনে পড়বে তখনই নতুন করে তাওবা করা আবশ্যক নয়। কিন্তু তার প্রবৃত্তি যদি পূর্বের পাপময় জীবনের স্মৃতিচারণ করে আনন্দ পায় তাহলে গোনাহর স্মৃতিচারণ তাকে আনন্দ দেয়ার পরিবর্তে লজ্জাবোধ সৃষ্টির কারণ না হওয়া পর্যন্ত তার বার বার তাওবা করা উচিত। কারণ, যে ব্যক্তি সত্যিই আল্লাহর ভয়ে গোনাহ থেকে তাওবা করেছে সে অতীতে আল্লাহর নাফরমানী করেছে এই চিন্তা করে কখনো আনন্দ অনুভব করতে পারে না। তা থেকে মজা পাওয়া ও আনন্দ অনুভব করা প্রমাণ করে যে, তার মনে আল্লাহর ভয় শিকড় গাড়তে পারেনি।

২০. এ আয়াতের কথাটি ভেবে দেখার মত। এখানে এ কথা বলা হয়নি যে, তাওবা করলে তোমাদের অবশ্যই মাফ করে দেয়া হবে এবং তোমাদেরকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। বরং তাদের এই প্রত্যাশা দেয়া হয়েছে যে, যদি তোমরা সরল মনে তাওবা করো তাহলে অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তোমাদের সাথে এই আচরণ করবেন। এর অর্থ হলো, গোনাহগার বান্দার তাওবা কবুল করা এবং তাকে শাস্তি দেয়ার পরিবর্তে জান্নাত দান করা আল্লাহর জন্য ওয়াজিব নয়। বরং তিনি যদি মাফ করে দেন এবং পুরস্কারও দেন তাহলে তা হবে সরাসরি তার দয়া ও মেহেরবানী। বান্দার তাঁর ক্ষমালাভের আশা অবশ্যই করা উচিত। কিন্তু তাওবা করলে ক্ষমা পাওয়া যাবে এই ভরসায় গোনাহ করা উচিত নয়।

২১. অর্থাৎ তার উত্তম কার্যাবলীর পুরস্কার নষ্ট করবেন না। কাফের ও মুনাফিকদের এ কথা বলার সুযোগ মোটেই দেবেন না যে, আল্লাহর বন্দেগী করে এসব লোক কি প্রতিদান লাভ করেছে? লাঞ্ছনা ও অপমান পড়বে বিদ্রোহী ও নাফরমানদের ভাগে, বিশ্বাসী ও অনুগতদের ভাগে তা পড়বে না।

২২. এ আয়াতটি সূরা হাদীদের ১২ ও ১৩নং আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়লে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, ঈমানদারগণ যখন হাশরের ময়দান থেকে জান্নাতের দিকে যেতে থাকবেন তখনই তাদের আগে আগে 'নূর' অগ্রসর হওয়ার এই ঘটনা ঘটবে। সেখানে চারদিকে থাকবে নিকষ কালো অন্ধকার। যাদের জন্য দোযখের ফায়সালা হবে তারাই কেবল সেখানে অন্ধকারে ঠোকর খেতে থাকবে। আলো কেবল ঈমানদারদের সাথেই থাকবে। সেই আলোর সাহায্যে তারা পথ অতিক্রম করতে থাকবে। এই নাজুক পরিস্থিতিতে অন্ধকারে হাতড়িয়ে বেড়ানো লোকদের আর্তনাদ ও বিলাপ শুনে শুনে ঈমানদারদের ওপর হয়তো ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে থাকবে এবং নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা স্মরণ করে তারাও আশংকা করতে থাকবে যে, তাদের 'নূর' আবার ছিনিয়ে নেয়া না হয়

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٩﴾ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا ٱمْرَأَتَ نُوحٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ ۖ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَٰلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّٰخِلِينَ ﴿١٠﴾

হে নবী, কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো এবং তাদের প্রতি কঠোরতা দেখাও।[২৩] *তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। তা অত্যন্ত মন্দ ঠিকানা।*

আল্লাহ কাফেরদের ব্যাপারে নূহ এবং লূতের স্ত্রীদেরকে উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছেন। তারা আমার দুই নেক্‌কার বান্দার স্ত্রী ছিল। কিন্তু তারা তাদের স্বামীর সাথে খেয়ানত[২৪] *করেছিল। তারা আল্লাহর মোকাবিলায় তাদের কোন কাজেই আসতে পারেনি। দু'জনকেই বলে দেয়া হয়েছে ঃ যাও, আগুনে প্রবেশকারীদের সাথে তুমিও প্রবেশ কর।*

এবং দুর্ভাগাদের মত তাদেরকেও অন্ধকারে হাতড়িয়ে মরতে না হয়। তাই তারা দোয়া করতে থাকবে, হে আমাদের রব, আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দাও এবং জান্নাতে না পৌঁছা পর্যন্ত আমাদের 'নূর'কে অবশিষ্ট রাখ। ইবনে জারীর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا এর অর্থ হচ্ছে, যতক্ষণ তারা সহী সালামতে পুলসেরাত অতিক্রম করে না যায় ততক্ষণ যেন তাদের নূর অবশিষ্ট থাকে এবং নিভে না যায়। হযরত হাসান বসরী, মুজাহিদ এবং দাহহাকের তাফসীরও প্রায় অনুরূপ। ইবনে কাসীর তাদের এই উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, ঈমানদারগণ যখন দেখবেন মুনাফিকরা 'নূর' থেকে বঞ্চিত হয়ে গিয়েছে তখন তারা নিজেদের 'নূরে'র পূর্ণতার জন্য দোয়া করতে থাকবে (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল হাদীদ, টীকা—১৭)।

২৩. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আত তাওবা, টীকা—৮২।

২৪. এখানে খেয়ানতের অর্থ এ নয় যে, তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল। এখানে খেয়ানতের অর্থ হচ্ছে তারা হযরত নূহ (আ) ও লূতের (আ) সাথে ঈমানের পথে চলেনি, বরং তাদের বিরুদ্ধে দীন ইসলামের শত্রুদের সহযোগিতা করে এসেছে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ কোন নবীর স্ত্রী কখনো ব্যভিচারী ছিল না। প্রকৃতপক্ষে এ দু'জন মহিলার খেয়ানত ছিল দীনের ব্যাপারে। তারা হযরত নূহ (আ) ও হযরত লূতের (আ) দীন গ্রহণ করেনি। হযরত নূহের (আ) স্ত্রী তার কওমের জালেমদের কাছে ঈমান গ্রহণকারী সম্পর্কে খবর পৌঁছাত এবং হযরত লূতের (আ) স্ত্রী তার স্বামীর কাছে আগত লোকদের খবর তার কওমের দুশ্চরিত্র লোকদের কাছে পৌঁছে দিত। (ইবনে জারীর)

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ ۘ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۱﴾ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ ﴿۱۲﴾

আর ঈমানদারদের ব্যাপারে ফেরাউনের স্ত্রীর উদাহরণ পেশ করছেন। যখন সে দোয়া করলো, হে আমার রব, আমার জন্য তোমার কাছে জান্নাতে একটি ঘর বানিয়ে দাও। আমাকে ফেরাউন ও তার কাজকর্ম থেকে রক্ষা করো[২৫] এবং জালেম কওমের হাত থেকে বাঁচাও। ইমরানের কন্যা[২৬] মারয়ামের উদাহরণও পেশ করছেন, যে তার লজ্জাস্থানকে হিফাজত করেছিল।[২৭] অতপর আমি আমার পক্ষ থেকে তার মধ্যে রূহ ফুঁৎকার করছিলাম।[২৮] সে তার বাণীসমূহ এবং কিতাবসমূহের সত্যতা প্রতিপন্ন করেছে। সে ছিল আনুগত্যকারীদের অন্তরভুক্ত।[২৯]

২৫. অর্থাৎ ফেরাউন যেসব খারাপ কাজ কর্ম করে আমাকে তার মন্দ পরিণামের অংশীদার করে না।

২৬. হয়তো হযরত মারয়ামের বাপের নাম ইমরান ছিল, অথবা তাঁকে ইমরানের কন্যা বলার কারণ হচ্ছে, তিনি ইমরানের বংশধর ছিলেন।

২৭. এটা ইহুদীদের অপবাদের জবাব। ইহুদীদের অপবাদ ছিল, তাঁর গর্ভে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম (নাউযুবিল্লাহ) কোন গোনাহর ফল ছিল। সূরা নিসার ১৫৬ আয়াতে এই জালেমদের এই অপবাদকে "بهتان عظيم" মারাত্মক অপবাদ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন—নিসা, টীকা—১৯০)।

২৮. অর্থাৎ কোন পুরুষের সংস্পর্শ ছাড়াই তার গর্ভাশয়ে নিজের পক্ষ থেকে একটি প্রাণ সৃষ্টি করা হয়েছিল। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন—নিসা, টীকা ২১২ ও ২১৩; সূরা আল—আম্বিয়া, টীকা—৮৯)।

২৯. যে উদ্দেশ্যে এই তিন শ্রেণীর নারীর উদাহরণ পেশ করা হয়েছে এই সূরার ভূমিকায় তার ব্যাখ্যা করেছি। তাই এখানে তা পুনরালোচনার প্রয়োজন নেই।